একজন রাজার প্রতারণাতে শত্রুপক্ষ আবার জয় লাভ করিল। ম্যাট্‌সিনি দুঃখিত হইয়া আবার সুইজরল্যাণ্ডে গমন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে রোম নগরের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে নগরের প্রভু পোপ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, রোমবাসী প্রজাগণ রাজাকে তাড়াইয়া নিজেরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনি চির দিন প্রজার পক্ষ, তিনি শুনিবামাত্র রোম নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রোমে প্রজাগণ রাজত্ব করিতে লাগিল। নগরবাসীগণ তিন জন প্রধান ব্যক্তিকে পছন্দ করিয়া তাহাদের প্রতি দেশ রক্ষার ভার দিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। শত শত ভদ্রবংশীয় যুবক সৈন্য-দলে প্রবেশ করিয়া দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু আবার এক নূতন শত্রু দেখা দিল। ফরাসি দেশের রাজা লুই নেপোলিয়ান রোমের তাড়িত প্রভু পোপের পক্ষ হইয়া রোমবাসীদিগকে পরাজিত করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া রোমকে পরাস্ত করিল। ম্যাট্‌সিনি আবার সুইজরল্যাণ্ডে গমন করিলেন।

এই সময় হইতে ইটালীদেশে যে আগুন জ্বলিল তাহা আর নিবিল না, আজ এদেশ বিদ্রোহী হয়, কাল ওদেশ বিদ্রোহী হয়, এইরূপে প্রজারা কেবল আপনাদের দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৫৭সালে দক্ষিণ ইটালীর নেপল্‌স নামক নগরবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া আপনাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিল এবং নিজেরা দেশ শাসন করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী নামক একজন বীর পুরুষ নেপল্‌স জয় করিয়া দিলেন। তিনি নেপল্‌সের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনি নেপল্‌সে ফিরিয়া আসিলেন এবং গ্যারিবল্ডীকে অন্যান্য দেশকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমানুয়েল নামক মিলান দেশীয় রাজার হস্তে নেপল্‌স রাজ্যের ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাট্‌সিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এ দিকে ইটালী দেশে ক্রমে এক একটী দেশ অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে লাগিল এবং ভিক্টর ইমানুয়েল প্রায় সমুদয় ইটালীর রাজা হইলেন।

ম্যাট্‌সিনির মনে বরাবর দুইটী ইচ্ছা প্রবল ছিল, প্রথম ইচ্ছা যে ইটালীর সকল দেশ এক হইয়া এক জাতি হইবে, দ্বিতীয় ইচ্ছা যে ইটালীতে প্রজাগণ স্বদেশ শাসন করিবে, কোন রাজার অধীন হইবে না। তাঁহার প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে ইটালীর এক একটী দেশ বিদেশীয়-দের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল এবং এক রাজার অধীন হইল। সমুদয় দেশে এক স্বাধীনতার ভাব ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছাটী পূর্ণ হইল না। তিনি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আবার ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরে সিসিলী নামক দ্বীপের লোকেরা প্রজাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি আর এক বার সিসিলী দ্বীপে আসিলেন। কিন্তু এইবারে একজন প্রবঞ্চক তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। তাঁহাকে আবার কারাগারে বদ্ধ করিল। কিন্তু তখন ইটালী দেশের লোক তাঁহাকে এত ভালবাসে যে, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। পাছে তাঁহাকে কষ্ট দিলে দেশে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়— এই ভয়ে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে কারাগারে ক্লেশ দিতে পারিত না। এমন কি, কিছু দিন পরে

তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি আবার উৎসাহের সহিত তাঁহার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর পরিশ্রম করিবার পর ১৮৮২ সালে তিনি আর একবার ইংলণ্ডে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল; শরীরের সেইরূপ অবস্থায় আল্পস্ পর্ব্বত পার হওয়াতে, তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মিল। এই পীড়াতে কিছু দিন কষ্ট পাইয়া তিনি ১৮৮২ সালের ১৮ই মার্চ্চ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! মানুষ আপনার দেশকে কতদূর ভাল বাসিতে পারে দেখিলে ত? বেচারা চির জন্মটা দেশ ছাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কত বার প্রাণসংশয় হইল; দুইবার কয়েদ হইলেন; বিদেশে পরের মধ্যে কত কষ্ট পাইলেন; তবু স্বদেশের প্রতি তাঁহার ভালবাসা কমিল না বরং দিন দিন বাড়িতে লাগিল। স্বদেশকে পরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিব এই ইচ্ছার জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা ছিল, তোমরা তাহা শুনিলে, গরিবের প্রতি কত দয়া ছিল তাহাও দেখিলে। যখন তিনি স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে ছিলেন, তখনও তিনি কেমন নিজের দেশের গরিব লোকদিগকে একত্র করিয়া পড়াইতেন। এমন লোক দেশে জন্মিলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। তোমরা যাহাতে ইহাঁর মত হইতে পার সেই চেষ্টা কর।

দুটী-বোন্।

(১)

মধুর বসন্ত কাল
দিবা অবসান প্রায়,
রাঙ্গা রবি-ছবি খানি
ধীরে ধীরে চলে যায়।

(২)

মধুর বহিছে বায়ু
শীতল করিছে কায়,
ডালে বসি কত পাখী
সুমধুর গান গায়।

(৩)

দেখিয়া এ সুসময়
দুটী মেয়ে হাসি হাসি
হাত ধরা-ধরি করি
বাগানে বসিল আসি।

(৪)

সরলা সুশীলা বালা
বড় ভাব দু-জনায়,
দুটী ফুল গাঁথা যেন
একটী বোঁটার গায়।

(৫)

দেখি শোভা, দুটী বোনে
মহা পুলকিত-কায়,
বসিয়া বকুল-তলে
পরমেশ-গুণ গায়।

(৬)

পরেতে সুশীলা উঠি
হাসি হাসি মুখে বলে,

"আজ দিদি প্রাণ-ভ'রে
তোমারে সাজাব ফুলে।"

(৭)

এত বলি ছুটে গিয়া,
আঁচল-ভরিয়া কত
তুলি ফুল সযতনে
সাজাইল মনোমত।

(৮)

করতালি দিয়া তবে
হাসিয়া হাসিয়া কয়,
"আহা মরি দিদি আজ
কি শোভা হ'য়েছে হায়।"

(৯)

এত বলি সরলারে
ঘিরি ঘিরি বার বার
করতালি দিয়া দিয়া
গান করে, নাচে আর।

(১০)

সরলা উঠিয়া তবে
মধুর মধুর-হাসে,
বলে "বোন তোমারেও
সাজাইব মন-আশে।"

(১১)

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া
কত শত ফুল তুলে,

থরে থরে সযতনে
সাজাইয়া দিল চুলে।

(১২)

গড়িয়া ফুলের বালা
পরাইয়া দিল করে;
গাঁথিয়া ফুলের-হার
গলে দিল থরে থরে।

(১৩)

হাসিয়া হাসিয়া তবে
আনি দুটী চাঁপা ফুল,
ধীরে ধীরে দুটী কাণে
পরাইয়া দিল দুল্।

(১৪)

হ'লে সাজ মনোমত
মুখ-খানি ধরি করে,
সোহাগের চুম দিয়া
বলিল মধুর-স্বরে।

(১৫)

"আহা মরি সুশীলারে,
কি শোভা হ'য়েছে তোর।
চিনিতে না পারি আমি
এই কি সুশীলা মোর?

(১৬)

চল বোন, চল চল
মায়েরে দেখাব আজ,
কতই হবেন সুখী
দেখিয়া তোমার সাজ।"

(১৭)

এত বলি সুশীলার
হাত খানি ধরি করে,
হাসি হাসি মুখ দুটী
চলিল দুজনে ঘরে।

(১৮)

মায়েরে ডাকিয়া বলে,
"দেখ মা এসেছে কারা
চিনিতে কি পার তুমি
তোমার মেয়ে কি এরা?"

(১৯)

হাসিয়া মা আসি কাছে
চুমিলেন গলা ধরি,
বলিলেন "মেয়ে নয়
আকাশের দুটি পরী!"

(২০)

শুনিয়া মায়ের কথা
লাজে মাথা নত ক'রে
মুখেতে মধুর হাসি
দুজনে পলায় ঘরে!

(২১)

আহা এই দুই বোনে
কি সুন্দর ভালবাসা!
দেখিলে জুড়ায় আঁখি
মেটেনা মনের আশা!

(২২)

সরলা সুশীলা মত
তোমরাও হও বোন্,
ভাল বাস পরস্পরে
পিতা মাতা সুখে রোন্!

উকিলের পরামর্শ।

ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলে বিলাতের ঠিক দক্ষিণে সমুদ্রপারে যে দেশ দেখিতে পাইবে উহার নাম ফ্রান্স বা ফরাসিদেশ। এই দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে, লয়ার নদীর তীরে ন্যাণ্ট্‌স্ নামে একটী বড় সহর আছে। ইহা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। এই সহরটী সমুদ্রের উপকূল হইতে ১৩।১৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। কিন্তু মানচিত্রে অল্প স্থানের মধ্যে অনেক দেশ, নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র দেখাইতে হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে যাহা ১৩।১৪ ক্রোশ, মানচিত্রে তাহা দুই এক অঙ্গুলি মাত্র। তোমরা যদি ম্যাপে ন্যাণ্ট্‌স্ নগর বাহির করিতে চাও তবে ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে যেখানে লয়ার নদী সমুদ্রের সহিত মিশিতেছে সেই খান হইতে ঐ নদীর কাল দাগের উপর দিয়া তোমাদের সরু সরু আঙ্গুলের এক কি দেড় আঙ্গুল পূর্ব্ব দিকে আসিলেই ন্যাণ্ট্‌স্ নগর দেখিতে পাইবে। এই ন্যাণ্ট্‌স্ সহর সমুদ্র হইতে যতদূর, ন্যাণ্ট্‌স্ হইতে উত্তর দিকে তাহার কিছু কম দ্বিগুণ পথ চলিয়া গেলে রেন্ নামে একটী ক্ষুদ্র সহর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা উহারই সন্নিকটে ঘটিয়াছিল।

রেন্ কলিকাতার মত আধুনিক সহর নহে। সহরটী বহু কালের। এই স্থানটী ভাল ভাল উকিলের আবাসস্থল বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। এমন কি ইহার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহের লোকদিগের ধারণা এই যে, উক্ত সহরে গেলেই কোন উকিলের নিকট গিয়া যাহাহউক একটা পরামর্শ লওয়া অত্যাবশ্যক।

একদিন বার্নার্ড্ নামক একজন কৃষক কোন কার্য্যোপলক্ষে রেন্ সহরে গিয়াছিল। কার্য্য শেষ হইলে পর সে মনে মনে ভাবিল, "এখনও যে সময় রহিয়াছে তাহাতে আমি আরও দুই তিন ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করিতে পারি। তবে এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? কোন ভাল উকিলের নিকট একটা পরামর্শ লইয়া যাই।"

বার্নার্ড্ রেন্ নগরে ফয় নামক উকিলের বিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছিল। সকলে বলিত যে, তিনি যে পক্ষে থাকেন সে পক্ষের জয় নিঃসন্দেহ। কৃষক তাঁহার পরামর্শ লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাঁহার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে পর উকিল তাঁহাকে আপনার বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৃষক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়ের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি। অদ্য সহরে আসিবার দরকার হওয়াতে ভাবিলাম, আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব।"

উকিল বলিলেন, "তুমি বোধ হয় কাহারও নামে নালিশ করিতে চাও?"

সরল প্রকৃতি কৃষক উত্তর করিল, "না, মহাশয়! আমার কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ নাই।"

উকিল। "তবে বুঝি কোন বিষয় আশয় বখ্‌রা করিবার জন্য পরামর্শ চাই?"

কৃষক। "না মহাশয়! যাহাদের এক কূয়া হইতে জল খাইতে হয় তাহাদের কি ভাগাভাগি করিলে চলে? আমাদের বংশে কখনও বিষয় ভাগ হয় নাই।"

উকিল। "তবে কি কোন বিষয় কেনা বেচা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিয়াছ?"

কৃষক। "না, মহাশয়! আমার এত টাকা নাই যে বিষয় কিনি, আর আমি এত গরিব হইয়া পড়ি নাই যে, বিষয় বেচিতে হইবে।"

উকিল মহা ফাঁপরে পড়িয়া অবশেষে বলিলেন, তবে তুমি কি চাও, স্পষ্ট করিয়া বল দেখি।"

কৃষক উত্তর করিল, "সে ত আপনাকে আগেই বলিয়াছি। আমি আপনার পরামর্শ চাই। অবশ্য আমি আপনার ন্যায্য ফি দিতে প্রস্তুত আছি।"

কৃষকের ভাব গতিক দেখিয়া উকিলের মুখে একটু হাসি আসিল। অবশেষে তিনি কাগজ কলম হাতে লইয়া কৃষককে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

এতক্ষণে উকিল তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া, কৃষক বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে বলিল, "আমার নাম পিটার বার্নার্ড্।"

"তোমার বয়স কত বৎসর?"

"সাড়ে সাত গণ্ডা কি আট গণ্ডা।"

"তোমার পেসা?"

"সে কি?"

"তুমি কি কাজ কর্ম্ম কর?"

"ওঃ! তার নাম পেসা? তাই বলুন না। আমি চাস বাস করি।"

উকিল মহাশয় কাগজে দুই ছত্র কি লিখিয়া, কাগজ খানি মুড়িয়া সেই অদ্ভুত মক্কেলের হস্তে দিলেন।

কৃষক কাগজখানি পাইয়া বলিল, "ইহার মধ্যেই হইয়া গেল? ভাল, ভাল, আচ্ছা মহাশয়! আমাকে কত দিতে হইবে?"

"তিন ফ্রাঙ্ক (প্রায় দেড় টাকা)।"

উকিল বুঝিয়াছিলেন কিছু মূল্য না লইলে তাঁহার দত্ত পরামর্শের উপর তাঁহার মক্কেলের কখনই শ্রদ্ধা হইবে না। অযত্নলব্ধ পদার্থের প্রতি লোকের বড় একটা আদর দেখা যায় না।

কৃষক উকিলকে তিন ফ্রাঙ্ক দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সে যে রেন্ সহরে আসিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ উকিলের পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা ছাড়ে নাই, এই ভাবিয়া তাহার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

বার্নার্ডের বাড়ী ফিরিতে চারিটা বাজিল। পথশ্রমে তাহার শরীর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে মনে করিল, "আজি আর কোন কাজ কর্ম্ম করিব না। অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম করিতে হইবে।"

বার্নার্ডের শুষ্ক ঘাসের ব্যবসায় ছিল। আজি দুই দিন হইল মাঠের সমস্ত ঘাস কাটা হইয়া গিয়াছে। ঘাস শুকাইতেও বাকী নাই। ঘরে তুলিলেই হয়। এক জন কৃষাণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঘাস ঘরে তুলিয়া গাদা করা হইবে কি না। বার্নার্ডের পত্নী সেই সময়ে স্বামীর নিকটে বসিয়াছিল। সে কৃষাণের কথা শুনিয়া বলিল, "সে কি? এই সন্ধ্যা কালে ঘাস তুলিতে হইবে? কালিও ত ঘাস তোলা হইতে পারে, তবে আর এই অবেলায় কষ্ট করিবার দরকার কি?"

কৃষকের মন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, ঘাস তুলিলেও হয়, আবার আলস্য বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার স্মরণ হইল যে, তাহার পকেটে উকিলের পরামর্শের কাগজখানি আছে।

এই কথা স্মরণ হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "একটু থাম। আমার কাছে উকিলের পরামর্শ

আছে। এ বড় সাধারণ পরামর্শ নয়। ইহার জন্য আমার তিন ফ্রাঙ্ক খরচ হইয়াছে। আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য, ইহা হইতে নিশ্চয়ই জানা যাইবে।” এই বলিয়া বার্নার্ড্ পত্নীর হস্তে উকিলের লেখা কাগজখানি দিয়া বলিল, “তুমি এই লেখাটা পড় দেখি। আমার চেয়ে তুমি হাতের লেখা ভাল পড়িতে পার।”

কৃষক পত্নী কাগজখানি খুলিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা পাঠ করিল।

আজি যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না।

“ঠিক কথা!” বলিয়া বার্নার্ড্ উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল যেন সহসা অন্ধকারের মধ্যে আলোক আসিল। “আয়রে ছেলেরা সকলে মাঠে যাই। লোকে যে বলিবে, ‘বার্নার্ড্ তিন ফ্রাঙ্ক খরচ করিয়া পরামর্শ আনিয়া তাহার মত কাজ করিল না’ তাহা কখনই হইবে না। আমি উকিলের পরামর্শ মত চলিব।”—এই বলিয়া বার্নার্ড্ মহোৎসাহে মাঠের দিকে চলিল। তাহার দৃষ্টান্তে সকলেই কাজে লাগিয়া গেল। শীঘ্রই সমস্ত ঘাস ঘরে তুলিয়া গাদা করা হইল। পরে যাহা ঘটিল তাহা দ্বারাই বার্নার্ডের সদ্বিবেচনা ও উকিলের বহুদর্শিতা বেশ বুঝা গেল।

ঐ রাত্রিতেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল বাড়িয়া পথ ঘাট মাঠ প্লাবিত করিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া কৃষকগণ দেখে যে,যে সকল শুষ্ক ঘাস মাঠে পড়িয়াছিল সব ভাসিয়া গিয়াছে। যাহাদের ঘাস এইরূপে নষ্ট হইয়া গেল তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। বার্নার্ডের ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে আর যাহাদের জমি ছিল সকলেরই অত্যন্ত ক্ষতি হইল, কেবল বার্নার্ডের কোন ক্ষতি হয় নাই।

এই ঘটনা হইতে উকিলের প্রদত্ত উল্লিখিত পরামর্শের উপর তাহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। সকল কার্য্যেই সে উকিলের পরামর্শ মত চলিতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে বার্নার্ড্ তৎপ্রদেশের এক জন সমৃদ্ধিশালী কৃষকের মধ্যে পরিগণিত হইল।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদিগকে কি বলিয়া দিতে হইবে যে প্রত্যেক কার্য্যে উপরিলিখিত উকিলের পরামর্শ অনুসারে চলা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য?

অবাধ্যতার প্রতিফল।

প্রথম অধ্যায়।

ঠাকুরমা ও নাতি, নাতিনী।

রায়পুরের দক্ষিণ পাড়ায় নদীর ধারে এক খানি অতি ছোট কুঁড়ে ঘর আছে। সেই ছোট বাড়ীখানির কাছেই আর কোন বাড়ী দেখা যায় না। এ বাড়ীটী দেখিতে অতি সুন্দর। যদিও বাড়ী খানি অতি ছোট, কিন্তু খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; বাড়ীর সামনে একখানি অতি সুন্দর ফুলের বাগান, আর বাড়ীর ভিতরে গৃহস্থের প্রয়োজনীয়

শাক সবজীর বাগান। এই ছোট কুটীর খানিতে বড় বেশী লোক থাকেন না। এক বৃদ্ধা ও তাহার দুটী নাতি নাতিনী, এই তিন জন সেই কুটীরে থাকেন। এই বৃদ্ধাটী অতি সৎ, ধর্ম্ম-পরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী। কিরূপে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। কিরূপে তাহাদের সৎপথে রাখিতে হয় তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকই জানেন। যেমন গুণবতী ঠাকুরমা নাতি নাতিনী দুটীও তেমনি হইয়াছে। এমন ঠাকুরমার কাছে শিক্ষা পেলে কে আবার না ভাল হয়? নাতি-টীর নাম অভয়, বয়স ১৩ বৎসর; নাতিনীটীর নাম কুসুম, সে দশ বৎসরের মেয়ে। ইহাদের দুজনের স্বভাব অতি ভাল।

কুসুমের মন খানি যেন দয়া মায়ায় গড়া। সে কখন কোন রূঢ় কথা বলে না, আর একটী উচ্চ কথা শুনিতেও পারে না। যদি কেহ তাহাকে বকে, অমনি সে কাঁদিয়া ফেলে। কাহার নিষ্ঠুর ব্যবহার তার প্রাণে বড় লাগে। সে কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করিতে পারে না। পাছে কোন অন্যায় করে সেই জন্য সে সর্ব্বদাই ভীত। দাদা যদি কোন অন্যায় কাজ করে তবে সে কাঁদিতে বসে। আর কিসে দাদাকে ও ঠাকুর-মাকে সুখী করিতে পারে কেবল সেই ভাবনা ভাবে। ঠাকুরমা কোন কাজ করিতে গেলে, অমনি ছুটিয়া যায় ও বলে "ঠাকুর মা তুমি সর আমি করি, তুমি বসে বসে দেখ। তুমি এতদিন করেছ এখন আমার পালা; আমি এখন বেশ কাজ করতে পারি, না ঠাকুর মা?" কুসুমের কথাগুলি বৃদ্ধার প্রাণে যেন মধু ঢেলে দেয়। মনে মনে বলেন "তুমি চিরদিন বেঁচে থেকে এমন মিষ্টি কথা বল; আমি শুনে প্রাণ জুড়াই।" অভয়ও খুব ভাল ছেলে। সে সাহসী, পরিশ্রমী, মিষ্টভাষী এবং সত্যবাদী। কিন্তু তাহার দোষের মধ্যে সে খেলার ঝোঁকে কখন কখন ঠাকুর মার কথা অবহেলা করে। সেজন্য তাহার অধিক কিছু শাস্তিও পেতে হয় না। কারণ তার ঠাকুর মা নাতি নাতিনী দুটীকে প্রায় বকেন না। যদি কখন কিছু বলিতে হয় তাহা অতি মিষ্ট কথায় বলেন। তবে কুসুম কখন কখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে "দাদা তুমি ঠাকুর মার কথা শোন না কেন? আহা! তাতে ঠাকুর মার মনে কত কষ্ট হয়। ঠাকুর মা ত ভাল কথাই বলেন।" তখন অভয় বলে "না না! আমি আর করব না। তুই কথায় কথায় অত কাঁদিস্ কেন? তোর কান্নার জ্বালায় বাঁচা ভার। তোর দোষের মধ্যে এই প্রধান দোষ।" কুসুম মনে মনে ভাবে "তাইত আমি কি বড় কাঁদি, আর কাঁদিব না।" এই যে বাড়ীর সাম্নের বাগানটী ইহা অভয় ও কুসুমের শ্রমের ফল। তারা দুটী ভাই বোনে প্রত্যহ বিকালে বাগানে খাটে। কুসুম পুকুর হতে ছোট কলসী করে জল এনে এনে বাগানে দেয়। অভয় মাটি খোঁড়ে ও গাছ বসায়। কুসুম বাগান পরিষ্কার করে। বাস্তবিকই বাগানটী দেখিতে যে কি সুন্দর তাহা আর বলি-বার নহে। রোজ কত ফুল যে ফোঁটে তাহা বলা যায় না।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলা কেমন বেল, যুঁই ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। কুসুম রোজ ফুল তুলিয়া ঠাকুরমাকে দেয়। আবার এক দিন কুসুম ফুল তুলিয়া ঠাকুর মাকে সাজা-ইতে যায় "ঠাকুরমা তোমায় ফুল দিয়া সাজাই, চুল বেঁধে দি, আমার ভাল কাপড় পর তোমায় কেমন দেখায় দেখি। তোমায় খুব সুন্দর দেখাবে। তুমি পর পর, দুটী পায় পড়েছি।" ঠাকুর মা তার

কথা শুনে হাসিয়া বলেন—"দুর পাগ্‌লী দিদি আমায় পর্‌তে নাই। লোকে দেখ্‌লে হাস্‌বে। তুমিই পর। আমার কাজ নাই।" এইরূপ কুসুম সর্ব্বদাই ঠাকুরমাকে সুখী করিতে চায়। পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার ইহাদের মা বাপ নাই কি? আহা! তোমাদের শুন্‌লে বড় দুঃখ হবে, যখন এই ছেলে মেয়ে দুটী অতি ছোট তখন ইহাদের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন কুসুম কেবল দশ মাসের মেয়ে। বৃদ্ধার প্রাণে যে কি ব্যথা লেগেছে তাহা এ পৃথিবীতে কেহ জানে না। তাঁর একমাত্র ধন তাঁকে এ সংসারে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুসুমের মা অতি লক্ষী মেয়ে ছিলেন। বৃদ্ধা বধুকে যে কি ভাল বাসিতেন তাহা বলিবার নয়। কুসুমের মার মৃত্যুর দুই তিন মাস পরেই তাঁহার পুত্রেরও মৃত্যু হয়। উঃ! এত শোক কি তাঁর সহ্য হয়! তাঁর প্রাণ যে কত কাঁদে তাহা কেহ জানে না। উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, কেবল তাঁদের দুজনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু প্রাণের দুঃখ প্রাণে চেপে রেখে হাসিমুখে বেড়াতে হয়। চোখের জল ফেলিবার সুযোগ তাঁর নাই। ওচোখে দুই ফোঁটা জল দেখিলে ভাই বোন্ অস্থির হইয়া উঠে। "ও ঠাকুরমা কাঁদ কেন, ও ঠাকুরমা কেঁদ না" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলে। ঠাকুরমা তাদের চোখের জল দেখে অতি কষ্টে নিজের চোখের জল চোখেই থামাইয়া রাখেন। যখন বালক বালিকা দুটী ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তাহাদের ঘুমন্ত পবিত্র মুখে বার বার চুম্বন করেন, আর হাত দুটী যোড় করিয়া ইষ্ট দেবতার কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। মনে মনে ভাবেন "হায়রে এরা যদি না হত, তবে আমার আঁধার প্রাণে মাঝে মাঝে কে আলো এনে দিত? এদের ব্যবহার কি চমৎকার! এদের যত্নে, ভালবাসায় আমি কত সুখী। হায়! হায়! এরা অতি দুঃখী, কখন বাপ মায়ের ভালবাসা পায় নাই। এরা কাহাকেও চেনে না। আমিই এদের সর্ব্বস্ব। এরা আমাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না। আহা! এরাও কি দুঃখী! বাছারা যে দুঃখী তাহা আদবেই বুঝে না। যত দিন এই ভাবে যায় তত দিনই ভাল, বুঝ্‌লে বড় কষ্ট পাবে। আমার ত এক দণ্ড এ পৃথিবীতে বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। এখনই মরিলে আর এক তিল বাঁচিতে চাই না; কিন্তু বাছাদের কথা ভাব্‌লে মনে হয়, আমি হাজার কষ্ট পাই না কেন, আমি গেলে এদের দশা কি হবে। বাপ্‌রে কাজ নাই, যতদিন ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন তত দিন এদের সেবা করে সুখী হই।"

অভয় ও কুসুম দুজনার চোখ সর্ব্বদাই ঠাকুরমার উপর। আর ঠাকুরমার চোখ তাদের দুজনের উপর।

এক দিন বিকালে অভয় বাগানের কাজ কর্‌ছে আর ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প কর্‌ছে; তখন ঠাকুরমা দরজায় বসে চর্‌কাতে সুতা কাট্‌ছেন। ঠাকুর মা নাতিতে কথা হওয়াতে ঠাকুরমা বলিলেন "দাদার আমার সব ভাল, সব দিকেই সোণার চাঁদ। কেবল দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে আমার কথায় অবহেলা করে।"

অভয়। "ঠাকুরমা আমি আর কখন তোমার কথায় অবহেলা কর্‌ব না। তুমি যখন যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। আমি ত তোমায় কষ্ট দিবার জন্য ইচ্ছা করে করি না—অমনি হয়ে পড়ে।"

ঠাকুরমা। "আচ্ছা দাদা! তোমায় আর কিছু বল্‌ছি না। দেখ যেন কথা রাখ্‌তে পার। আর যেন কালই কথা ভাঙ্গিতে না হয়।"

অভয়। "না ঠাকুরমা! আর হবে না। তুমি দেখ আমি রাখি কি না।"

ঠাকুরমা শুনে সুখী হলেন। আর কিছু বলিলেন না। পাঠক, পাঠিকাগণ আমরাও দেখিব অভয় কেমন করে তাঁর কথা রাখে।

জোয়ার ভাঁটা।

(২য় পাঠ।)

ত বারে দেখা গিয়াছে যে, চন্দ্র বা সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার ভাঁটা হইয়া থাকে। আজ ঐ বিষয়ের আরও অনেক গুলি কথা লিখিব। মন দিয়া পড়।

"পূর্ণিমা ও অমাবস্যা" নামক যে বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পড়িয়াছ যে, পূর্ণিমার দিন সূর্য্য যখন পশ্চিমে অস্ত যায় চন্দ্র তখন বড় গোলাকার থালাটীর মত পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতে দেখা যায়। আবার অমাবস্যার দিন যখন সূর্য্য অস্ত যায় চন্দ্রও সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়, রাত্রির মধ্যে আর দেখা দেয় না। এরূপ কেন হয়, তা তোমরা সহজেই বুঝিতেছ। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনি ঘুরে, সেজন্য ঐ সময়ের মধ্যে সূর্য্যকে পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়। সূর্য্য সমস্ত সৌর জগতের কেন্দ্র ও পৃথিবীর সম্বন্ধে স্থির। এজন্য উহা আজ ১২টার সময়ে মাথার উপর থাকে, কালও ১২টার সময়ে ঠিক মাথার উপর আসিবে। কিন্তু চন্দ্র সেইরূপ স্থির নহে; উহা পৃথিবীর চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এজন্য আজ সন্ধ্যা বেলা যদি মাথার উপর দেখা যায়, কাল ঐ সময়ে মাথার খানিকটা পূর্ব্ব দিকে থাকিবে, পরশু আরও একটু,—এইরূপ। এই জন্য সূর্য্য ও চন্দ্র একত্রে চিরকাল থাকে না। এক মাসের মধ্যে এক দিন একত্রে থাকে, ঐ দিন অমাবস্যা, তার পর হইতে ক্রমে পেছিয়া পড়ে ও অবশেষে পূর্ণিমার দিন ঠিক বিপরীত দিকে উপস্থিত হয় এবং আরও ১৫ দিনে আবার একত্র হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই সমুদ্র ও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বল দেখি কাহার আকর্ষণের বল অধিক? নিশ্চয়ই বলিবে—সূর্য্যের। কেন না উহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক লক্ষ (১৪ লক্ষ) গুণে বড়, আর চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। সুতরাং ইহাই মনে হওয়া সম্ভব যে সূর্য্যের আকর্ষণে উৎপন্ন জোয়ার অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার উৎপন্ন হয় তাহা অনেক কম হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, বরং বিপরীত; চন্দ্রাকর্ষণেই জোয়ারের তেজ অধিক। আশ্চর্য্য হইও না, ধীরভাবে শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।—গতবারেই দেখিয়াছ যে, আকর্ষণের মোট পরিমাণে জোয়ার হয় না। ধরাতলের এক অংশের উপর চন্দ্র বা সূর্য্যের যে আকর্ষণ তাহার অপেক্ষা দূরবর্ত্তী অপর কোন অংশের উপর উহাদের আকর্ষণের যে অল্পতা তাহারই উপর জোয়ার নির্ভর করে। এই নিয়মটী জোয়ার নিয়মের মূল। আবার বলি,—পৃথিবীর এক ভাগের জলকে

চন্দ্র বা সূর্য্য যত বলের সহিত আকর্ষণ করে, যদি তদ্বিপরীত দিকের জলকেও ঠিক সেই পরিমাণ বলের সহিত আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে জোয়ার ভাঁটা হইতই না। কেবল এই দুই স্থানে আকর্ষণের পরিমাণ কম বেশী হয় বলিয়াই জোয়ার হইয়া থাকে। ইহা তোমরা গত বারের ছবিতেই বুঝিবে।

উক্ত কম-বেশীর উপরই যদি জোয়ার নির্ভর করিল, তবে সহজেই বুঝা যায় যে সূর্য্যের আকর্ষণে যদি এই তফাৎ চন্দ্রাকর্ষণের অপেক্ষা বেশী হয় তবে সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার বেশী হইবে। আর যদি চন্দ্রাকর্ষণে এই তফাৎ অধিক হয় তবে উহাতেই জোয়ার বেশী হইবে। বাস্তবিক শেষটা ঠিক। অর্থাৎ ক যদি সূর্য্য হয়, তবে ব নামক

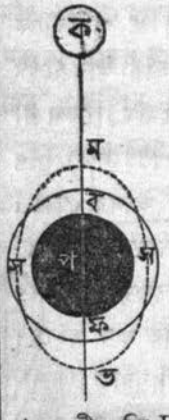

স্থানটীতে সূর্য্যের যত বল, তাহা অপেক্ষা ফ নামক স্থানটীতে উহার আকর্ষণের বল কম (দূর বলিয়া) মনে কর এই তফাৎ যেন A। তার পর, ক যদি চন্দ্র হয়, তবে ব নামক স্থানে উহার আকর্ষণের বল যত, তাহা অপেক্ষা ফ স্থানটীতে কম। মনে কর এই তফাৎ B। এখন কথাটী এই যে A বেশী, কি B বেশী? যদি A বেশী হয় তবে সূর্য্যের আকর্ষণে বেশী জোয়ার হইবে, আর যদি B বেশী হয় তবে চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার বেশী হইবে। দেখা যায় যে B বেশী। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার বেশী প্রবল হইয়া থাকে।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা এত ছোট অথচ উহার আকর্ষণের তারতম্য (তফাৎ) বেশী কেন হয়? তাহার কারণ এই যে, চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে আছে কিন্তু সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত। মোটামুটি এইটুকু বুঝাইয়াই আমাদিগকে থামিতে হইবে। আর উহার সূক্ষ্ম কারণ বুঝাইবার চেষ্টাও করিব না, কেন না সে গুলি একটু কঠিন ও জটিল। বড় হইয়া আপনারা বুঝিতে চেষ্টা করিও। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিব, সেই তুলনায় একটা মোটা রকমের ধারণা করিতে যত্নবান হও। মনে কর ব নামক একটী বালককে ২০টী টাকা দিলাম, আর ফ নামক আর একটীকে ১৫টী টাকা দিলাম, তাদের তফাৎ ৫৲ টাকা হইল। আর তুমি ব কে ৫০০ টাকা দিলে আর ফ কে ৪৯৯৲ টাকা দিলে তাদের তফাৎ ১৲ একটী টাকা হইল। এখানে তোমার চেয়ে টাকা আমি অনেক কম দিলাম সত্য, কিন্তু তাদের মধ্যে তফাৎ আমার ৫৲, আর তোমার ১৲টাকা মাত্র। অর্থাৎ উপরিলিখিত Bটী A অপেক্ষা বেশী। কাজেই চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ারের তেজ বেশী হয়।

এখন, আর একটী দরকারী কথা বুঝিতে পারিবে। তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে জোয়ারের যত তেজ অধিক হয় অন্য তিথিতে তত হয় না। ষষ্ঠী সপ্তমীতেও জোয়ার হয়, কিন্তু সে জোয়ার তত বেগবান্ নহে। তাহার কারণ কি?

চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই পৃথিবীর চারিদিকে সর্ব্বদা রহিয়াছে। উহারা যেখানেই থাকুক, পৃথিবী ও সাগরের কোন না কোন অংশকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় তাহাকে "সৌর জোয়ার" বলা যায়, আর চন্দ্রের আকর্ষণে উৎপন্ন জোয়ারকে "চান্দ্র জোয়ার" বলে। এই উভয় প্রকারের জোয়ারই সদা সর্ব্বক্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোথাও

না কোথাও উৎপন্ন হইতেছে। যে সাগরের উপর যখনই সূর্য্য উপস্থিত হয়, সেখানে ও তদ্বিপরীত ভাগে তখনই "সৌর জোয়ার" উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ যেখানে যখনই চন্দ্র থাকে সেখানে ও তার বিপরীত দিকে তখনই "চান্দ্র জোয়ার" উৎপন্ন হয়। এবং তাহাদের উভয় পার্শ্বভাগে "সৌর ভাঁটা" ও "চান্দ্র ভাঁটা" যথাক্রমে হইয়া থাকে। কিন্তু "চান্দ্র জোয়ার" "সৌর জোয়ার" অপেক্ষা অধিক প্রবল দেখা যায়। "সৌর জোয়ার" স্বতন্ত্র ভাবে দেখাই যায় না।

অমাবস্যার দিন চন্দ্র ও সূর্য্য এক দিকে থাকে, এজন্য "চান্দ্র জোয়ার" ও "সৌর জোয়ার" একত্র উৎপন্ন হয় ও দেখা যায়। তখন উহার বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, নাম—"ভরা কটালের জোয়ার"। আবার পূর্ণিমার দিনও চন্দ্র এবং সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে এক রেখায় অবস্থিতি করে, সুতরাং সে দিন চন্দ্রের নীচে সাগরের জোয়ার ও সূর্য্যের বিপরীত দিকের জোয়ার একত্র মিশে, এবং চন্দ্রের বিপরীত সাগরের প্রবল জোয়ার ও সূর্য্যের নীচের জোয়ার একত্র মিলিত হয়। এজন্য সে দিনও "ভরা কটালের জোয়ার" খুব প্রবল হইয়া থাকে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য ক্রমে এক রেখা হইতে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে এজন্য ক্রমে ঐ দুই জোয়ারও একত্র মিলিত অবস্থা হইতে সরিয়া যায়। ক্রমে ষষ্ঠী সপ্তমী তিথিতে সৌর ও চান্দ্র জোয়ার পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে কার্য্য করে। অর্থাৎ চান্দ্র জোয়ার যেখানে হয় সেইখানে সৌর ভাঁটা পড়িয়া যায় আর সৌর জোয়ারের স্থানে চান্দ্র ভাঁটা পড়ে। কিন্তু এই বিপরীত কার্য্যে (পূর্ব্বে যে কারণ বুঝাইয়াছি তাহার জন্য) চন্দ্রেরই জিৎ হয়। চান্দ্র জোয়ারটাই দেখা যায়, সৌর জোয়ার দেখাই যায় না। কিন্তু চন্দ্রের জোয়ারেরও সেই সময়ে খুব কম জোর হইয়া থাকে। ইহাকেই মাঝীরা "মরা কটালের জোয়ার" কহে। ছবি দেখ।

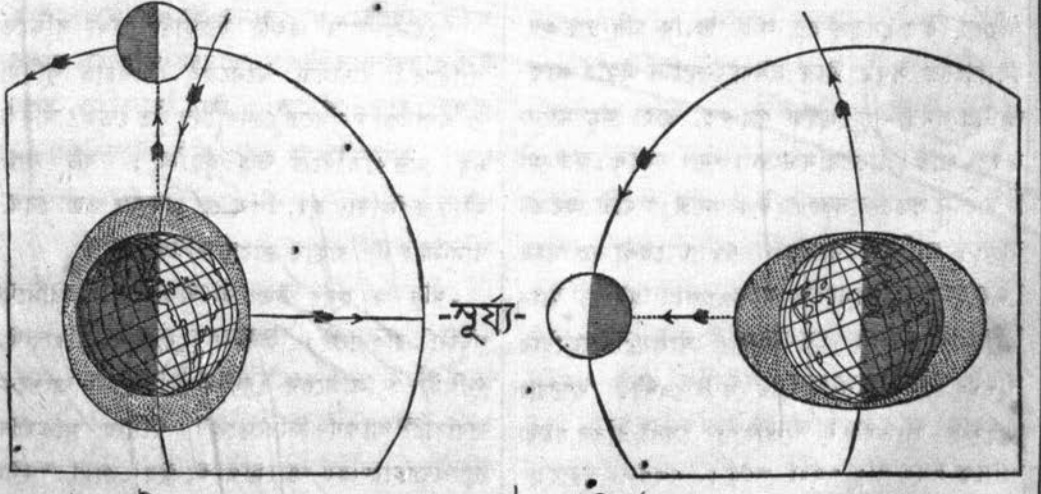

আর একটী কথা। বান্ ডাকে কেন? ভরা কটালের যখন ভাঁটা পড়ে, তখন খুব নীচে জল নামিয়া আসে। নদীর খোলের ভিতরে জলটুকু যেন মিলাইয়া থাকে, অথচ খুব জোরে সাগরের দিকে জল চলিতে থাকে। এমন সময়ে সাগরে প্রবল বেগে ভরা কটালের জোয়ার উঠিয়া সাঁ সাঁ

করিয়া ছুটিয়া নদীর মুখে প্রবেশ করে। এইখানে মহা গোল হয়। ভীষণ বেগে সাগরের প্রবল জোয়ারের জল নদীতে প্রবেশ করিতে যায়, নদীর খোলটীও ভাঁটাতে একেবারে খালি হইয়া রহিয়াছে। কাজেই ছোট একটী জলের পাহাড়, কি উচ্চ একটী জলময় দেয়াল যেন কল কল—সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সুমুখে যা পায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া ডুবাইয়া, তোলপাড় করিয়া বান্ ডাকে। কি ভয়ানক! কলিকাতার ষাঁড়াষাঁড়ীর বান্ দেখিবার জন্য কত লোক তীরে দাঁড়ায়। মাঝীরা সব ভয়ে আকুল হইয়া আপন আপন নৌকা লইয়া গভীর জলে গিয়া দাঁড়ায়; কেন না, সেখানে কিনারা অপেক্ষা বানের তেজ কম। যেখানে বড় চড়া পড়িয়াছে, সেই খানেই বানের তেজ খুব ভয়ানক।

জোয়ার সম্বন্ধে তোমাদিগকে আর একটী মাত্র কথা বলিব। নদীতে জোয়ার আসিলে জল যেমন সাঁ সাঁ করিয়া উপর দিকে চলিতে থাকে, সাগরে কিন্তু সেরূপ হয় না। তথায় জল কেবল জোয়ারের সময় উচ্চ হইয়া ফুলিয়া উঠে আর ভাঁটার সময় নীচু হইয়া পড়ে। এই উঁচু নীচু হওয়া আর স্রোতের মত চলা খুব তফাৎ। ইহা ঠিক যেন শস্যক্ষেত্রের ঢেউএর মত। ধান্যক্ষেত্রে বাতাস লাগিলে গাছগুলি যেমন ঢেউ খেলায় কিন্তু চলে না, সাগরের জলে জোয়ারের গতিও ঠিক সেই রকম। সেখানকার জল সেইখানেই থাকে, তথাকার জাহাজও সব ঠিক থাকে কেবল একবার খানিকক্ষণ জলটা উচ্চ হইয়া উঠে আর খানিক সময় নীচু হইয়া পড়ে। কেবল চড়াতে বা নদীর মুখেই জোয়ারের জল বেগবান হইয়া গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোঁদড়।

নেক স্থানেই ভোঁদড় দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই কলিকাতার পশুশালায় গিয়াছ; সেখানে একটা গোল চৌবাচ্ছায় যে কয়েকটা ভোঁদড় রাখা হইয়াছে তাহাদের কাছে ১০।৫ মিনিট দাঁড়াইয়াছ কি? আমি যত দিন সে গুলিকে দেখিতে গিয়াছি, এক দিনও তাহাদের কোনটাকে স্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। এক বার ডুব দেওয়া আর কিছু দূর গিয়া মুখ ভাসাইয়া পুনরায় ডুব দেওয়া,—কাযের মধ্যে তো এই; ইহা লইয়াই বেচারারা এত ব্যস্ত যে দেখিলে বোধ হয় ঐ জলটুকুর প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাহাদের পরিচয় থাকার উপরই ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা দেখিয়া হয় ত মনে করিয়াছ যে ঐরূপ করিয়া তাহারা জলের ভিতর মাছ খোঁজে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাছ খুঁজিতে হইলেও ঐরূপ করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কেবল আমোদ করিবার জন্যই ইহারা ঐরূপ করিয়া থাকে।

ভোঁদড়গুলি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। স্বাধীন অবস্থায় তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী জলার ধারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া যখন খেলা করে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীতে তাহাদের চাইতে সুখী জীব আর নাই। আমি বন্য ভোঁদড়ের খেলা কখনও স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাহার চাইতে আমোদজনক দৃশ্য

বড় অধিক নাই। দিনের বেলায় কিন্তু ইহারা তত মন খুলিয়া আমোদ করিতে পারে না; সূর্য্য অস্ত গেলেই তাহাদের আনন্দের সময় হয়। তাহাদের খেলার একটা বেশ নিয়ম আছে। প্রথমে সংগীত, তার পর ব্যায়াম। কোন কোন সময় ব্যায়াম এবং সংগীত এক কালেই চলিতে থাকে। তাহারা কোন্ রাগিণী কোন্ তাল অবলম্বন করিয়া কি গান গায়, তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি; তবে ব্যাপারটা কিরূপ হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। অনেক ছেলের গান গাইবার একটা বাতিক আছে। তাহাদের গানে পৃথিবীর সকল প্রকারের রাগিণী এবং সকল প্রকারের তালই এক সময়ে ব্যবহার হয়। মনে কর এইরূপ কুড়িজন ছেলে তিন রাত্রি বাহিরে বসিয়া চ্যাঁচাইল, আর হিম লাগিয়া তাহাদের গলা বসিয়া গেল——এখন কথা কহিতে গেলে কেবল একটা সাঁই সাঁই শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এখন যদি এই কুড়িজন ছেলে রাত্রিতে নদীর ধারে কোন নির্জ্জন বনে গিয়া গান গায়, আর ম্যাও ম্যাও করে, আর শেয়ালের ডাক ডাকে, আর কাশে, আর নাকে কাঠি দিয়া ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিয়া হাঁচে, তবে ভোঁদড় পরিবারের গানের কতকটা নকল করিতে পারে। ইহাদের ব্যায়াম উল্টাবাজি। তোমাদের ব্যায়াম-শিক্ষক হয়ত তোমাদিগকে দুই তিনজনে মিলিয়া মাটির উপর উল্টাবাজি করিতে হইলে কিরূপ করিতে হয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন। না দিয়া থাকিলেও আমাদের দেশী বাজিকরদিগকে ঐরূপ করিতে অবশ্যই দেখিয়াছ। ভোঁদড়েরা ২০। ২৫টী মিলিয়া একটা পিণ্ডের আকার ধারণপূর্ব্বক ঐ বাজি করে। তবে তোমাদের উল্টাবাজিতে আর তাহাদের উল্টাবাজিতে একটু তফাৎ আছে। তোমরা সমান জমির উপর উল্টাবাজি কর, তাহারা ডাঙ্গার উপর হইতে উল্টাবাজি করিয়া গড়াইয়া জলে পড়ে।

আমি যখন খুব ছেলে মানুষ ছিলাম, তখন

আমাদের বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীর কাছে অনেক ভোঁদড় আছে। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে ভোঁদড়ের প্রতিহিংসা লইবার বৃত্তিটা বড় প্রবল। কাহারও উপর কোন কারণে চটিলে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। ঐ ভদ্রলোকটীর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই রাত্রিতে ছোট নৌকায় উঠিয়া মাছ ধরিতে যাইতেন। এক দিন নৌকার সম্মুখে একটা ভোঁদড় দেখিতে পাইয়া তাহাকে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া গুঁতা মারিলেন। গুঁতা খাইয়া ভোঁদড়টা ক্যাঁচম্যাচ করিয়া উঠিল; আর অমনি নৌকার চারি ধারে কতকগুলি ভোঁদড় মাথা জাগাইল। তিনি বলিয়াছেন যে "সৌভাগ্যের বিষয় সেখানে অনেকগুলি ভোঁদড় ছিল না, সুতরাং তাহারা নৌকা আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই, নতুবা সে দিন তাঁহার প্রাণ লইয়া ঘরে আসাই দায় হইত।"

ভোঁদড়েরা মাছ ধরিয়া খায়; মাছ ধরিতে ইহারা এত পটু যে, কোন কোন দেশের জেলেরা ইহাদের সাহায্যে মাছ ধরিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। ভোঁদড়ের সাহায্যে মাছ ধরাটা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিও না। ভোঁদড় মাছ ভাল ধরিতে পারে সত্য; কিন্তু ধরিলে কি হইবে, পেটুক দুষ্টু ছেলের হাতে সন্দেশ দিলে যেরূপ হয়, অশিক্ষিত ভোঁদড়ের উপর মাছ ধরিবার ভার দিলেও সেইরূপই হয়। ভোঁদড় মাছ পাইলেই খাইয়া ফেলে। খাইতে খাইতে পেট ভরিয়া গেলেও মাছ ধরিতে ছাড়ে না। পেট ভরিলে মাছ খায় না, কিন্তু ধরিয়া তাহাকে দাঁতে টুক্‌রা টুক্‌রা করে। সুতরাং তখন ভোঁদড় মাছ না খাইলেও ওরূপ জন্তুকে মাছ ধরিতে দিয়া মৎস্য-ব্যবসায়ীর লাভ অতি অল্পই হয়।

ভোঁদড়কে দিয়া মাছ ধরাইবার ইচ্ছা থাকিলে খুব ছোট ছানা ধরিয়া আনিতে হয়। সেই ছানাকে মাছ খাইতে দিবে না; কেবল নিরামিষ খাওয়াইয়া তাহাকে পুষিবে। ভোঁদড় সহজেই কুকুরের মতন পোষ মানে। কোন জিনিস ছুড়িয়া ফেলিলে কুকুরের ন্যায় ভোঁদড়ও তাহা আনিয়া দিতে শিখিতে পারে। প্রথমতঃ তাহাকে ঐরূপে নানাপ্রকারের জিনিস আনিয়া দিতে শিখাইতে হয়। এই বিষয়টা খুব ভালরূপ শিক্ষা হইলে শুক্‌নো মাছ দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। মাছের ছালের ভিতর খড় পূরিয়া তাহাদ্বারা প্রথমতঃ পরীক্ষা করিলে আরো ভাল হয়। শুক্‌নো মাছ আনিয়া দিতে শিক্ষা হইলে অর্থাৎ যদি দেখ যে ভোঁদড় সেই শুক্‌নো মাছটাকে খাইয়া ফেলিবার মত কোন ভাব প্রকাশ না করে —তাহা হইলে তাহাকে মরা মাছ আনিতে দিবে। মরা মাছের পাঠ ভালরূপ শিক্ষা হইলে তাহাকে নির্ভয়ে জলে ছাড়িয়া দিতে পার।

ভোঁদড়ের লোম অতি কোমল। এই জন্য অনেক লোকে ভোঁদড় মারিয়া তাহার ছাল বিক্রয় করে। সেই ছালে বড়লোকের পা রাখিবার আসন তৈয়ারি হয়; আরো অনেক জিনিস তৈয়ারি হয়।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি নদীর পার ঢালু হইলে ছেলেরা তাহাকে জল দিয়া পিছল করিয়া লয়, এবং তাহার উপর দিয়া জলে পিছলাইয়া পড়িয়া খেলা করে। কানাডা দেশীয় ভোঁদড়গুলিও এই খেলা জানে। সেখানে ঢালু ও মসৃণ বরফের উপর উপুড় হইয়া ভোঁদড়গুলি খেলা করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা এইরূপে ৪০ হাত পর্য্যন্ত পিছলাইয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—স্থানাভাব বশতঃ এবারে 'বেলুনের প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইল না।

সখা।
চতুর্থ ভাগ। পঞ্চম সংখ্যা।
১ মে, ১৮৮৬। বৈশাখ, ১২৯৩।

প্রবাল কীট।

পলাকাটি তোমরা কি দেখ নাই? সেই যে লাল লাল ছোট ছোট ফুলের মত গাঁথিয়া লোকে মালা করে। ফকিরদিগের গলাতে অনেক সময় দেখা যায়। ঐ পলাকাটি কিরূপে জন্মে তাহার বিবরণ কি জান? প্রথমে সেই দ্বীপনির্ম্মাণকারী প্রবালের বিষয় কিছু বলিব; পরে লাল পলাকাটি সংগ্রহের বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

তোমরা সকলেই জান যে পুকুরে মাছই কেবল থাকে না, অন্য অনেক রকম পোকা মাকড়ও জলের মধ্যে বাস করে। কত প্রকারের ঝিনুক, শামুক, গুগ্‌লী ও অন্যান্য নানা রকম কীট জলে থাকে। নদীর জলেও সেইরূপ হাঙ্গর, কুম্ভীর ও বড় বড় মাছের সহিত লক্ষ লক্ষ রকমের জীব বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে যে কত রকম জীব জন্তু আছে কে তাহার গণনা করিতে পারিবে? একদিকে যেমন প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত তিমি মাছ সকল সাগরের মধ্যে ডুবিয়া, ভাসিয়া, খেলিয়া বেড়াইতেছে আর একদিকে আবার ক্রমে ছোট হইতে আরও ছোট, অবশেষে এত ছোট ছোট কীটাণু অসংখ্য অসংখ্য একত্রে বিচরণ করে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাস্তবিক সাগর পরমেশ্বরের এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টি!

প্রবাল কীট সাগরের জলের এইরূপ এক জাতীয় কীটবিশেষ। তাহাদের মধ্যে আবার নানা জাতীয় কীট দেখা যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার চারুপাঠে কয়েক জাতীয় কীটের ছবি দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে অনেক জাতি দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কীট; এমন কি অনেক অংশে ইহাদিগকে কীট না বলিয়া উদ্ভিদ বলিলেও বলা যায়। কীটদিগের দেহের গঠন প্রণালীর মধ্যে রীতিমত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে, তাহাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের ও শ্বাস প্রশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা দেখা যায় কিন্তু ইহাদের প্রায়ই তাহা নাই। ইহাদের পাকস্থলীর গঠন ও কার্য্যপ্রণালী ঠিক কীটদিগের মত নয়, এবং কীটদিগের স্নায়ু ও শিরাসমূহের যেরূপ সুব্যবস্থা দেখা যায় ইহাদের দেহমধ্যে তাঁহারও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রবাল জাতীয় কীটগুলি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কীট, অথবা কেহ কেহ বলেন যে কীট ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি এক প্রকার সৃষ্ট বস্তু।

উপরে একটী প্রবাল কীটের ছবি দেওয়া গেল। এই জাতীয় কীটেরাই দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। অন্যান্য যে সকল কীট ইংলণ্ড বা অন্য দেশে সচরাচর দেখা যায় তাহারা দ্বীপ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তাহাদের ঐ টবের মত কঠিন আবরণটী থাকে না। তাহাদের শরীরের সমস্তই একটা শক্ত মাংসের মত বা রবারের মত পদার্থে নির্ম্মিত। অর্থাৎ ঝিনুক বা শামুকের দেহ যেরূপ চট্‌চটে ও শক্ত মাংসের দ্বারা তৈয়ারী, সাধারণতঃ এই সকল কীটেরও তাই। তাহারা শৈবালাদির ন্যায় এক স্থানেই চিরদিন লাগিয়া থাকে। কোন কারণে স্থানচ্যুত হইলে শামুকেরা যেমন নিজেদের দেহ কুঞ্চন করিতে করিতে চলে, ইহারাও সেইরূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাটি বা পাথরের গা বহিয়া বহিয়া যাইতে পারে। শামুকের যেমন দুটী শুঁড় থাকে, ও মাঝখানে একটা বড় রকমের গর্ত্ত থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ অনেকগুলি শুঁড় (লেবুফুলের মত, ছবি দেখ) থাকে ও মধ্যস্থলে একটু বড় রকমের একটী গর্ত্তও দেখা যায়। ঐ গর্ত্তটা ইহাদের মুখ আর শুঁড়গুলি ইহাদের ইন্দ্রিয়ের মত। যদি একটু কিছু কঠিন বস্তু তাহাতে লাগে, অমনি সমস্ত শুঁড়গুলি ঝাঁ করিয়া বুজিয়া যায়, আর কীটকে তখন জন্তু বলিয়াই বুঝা যায় না; মনে হয় যেন একটা ছোট দোয়াৎ কি অন্য কিছু পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ মুখের মধ্যে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীট বা অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী পড়ে তাহাই ইহাদের আহার হয়। মুখ দিয়া ক্রমে পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও তথায়ই হজম হইয়া খাদ্যের সারভাগ দুধের মত এক রকম জিনিস হইয়া কীটের শরীর পোষণ করে; অবশিষ্ট অসার ভাগ মুখ দিয়াই আবার বাহিরে আসে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণতঃ এই সকল কীটের দেহ কেবল রবারের মত এক প্রকার কঠিন মাংসে নির্ম্মিত। ইহারা কিন্তু দ্বীপ নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না। তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় কীটের অঙ্গের নিম্নভাগে এক এক প্রকার কঠিন আবরণ হয় (ছবি দেখ) ইহারাই যথার্থ প্রবাল দ্বীপ নির্ম্মাণকারী কীট। ইহাদের শরীরে দুধের মত যে এক প্রকার পোষণকারী পদার্থ থাকে তাহার সাহায্যে সাগরের লোণা জল হইতে ঐ প্রকার কঠিন আবরণ প্রস্তুত হয়। মানব শিশুদিগের দেহে যেমন রক্তের সাহায্যে দুধ হইতে হাড় প্রস্তুত হয়, ইহাদেরও সেইরূপ দুগ্ধবৎ রক্তের সহিত সাগরের জলের যোগে এই কঠিন আবরণ হইয়া থাকে। ছবিতে যে কীটটী দেখিতেছ তাহার নিম্নের ঐ টবের মত বস্তুটীই এই আবরণ। তদুপরি শুঁড় ও মুখ এবং তাহার মধ্যে উহার উদর ও অন্যান্য অংশ। লাল প্রবাল আর এক জাতীয়।

এইরূপে প্রবালকীট জীবন ধারণ করে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির প্রণালীও আশ্চর্য্য। তিন প্রকারে প্রবালকীটদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক একটা কীট অসংখ্য ডিম্ব প্রসব

করে ; ঐ সকল ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া ছড়াইয়া পড়ে ও নানা স্থানে পড়িয়া নূতন নূতন কীট হইয়া লাগিয়া থাকে ও ক্রমাগত উক্তরূপে বাড়িয়া উঠে ও আবার প্রত্যেকটা অসংখ্য ডিম পাড়ে! এইরূপে অসংখ্য কোটি প্রবাল কীট জন্মিতেছে, ও বাড়িতেছে। আবার কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, একটা কীট হঠাৎ দুভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্র কীট হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা অনেকে পুরুভূজের কথা চারুপাঠে পড়িয়াছ, তাহার অঙ্গের কোন অংশকে ছিন্ন করিলেই তাহা আবার একটী স্বতন্ত্র পুরুভূজ হইয়া উঠে। সেই রূপ একটা প্রবাল দুখানা হইয়া দুটা আলাদা আলাদা প্রবাল রূপ ধারণ করে। আবার সেই দুটা চারিটা হয় ইত্যাদি। এইরূপে, আরও এক উপায়ে প্রবালেরা বর্দ্ধিত হয়। গাছে যেমন কুঁড়ি হয়; ইহাদেরও সেইরূপ কুঁড়ি হইতে দেখা যায়। একটা প্রবালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কুঁড়ি হইয়া তাহাদের প্রত্যেকটী আবার স্বতন্ত্র কীট হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ছড়াইয়া যায় না। প্রথমটীর গায়ে লাগিয়া থাকে। এইগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। গাছের ডালে পানার মত হইয়া চারিদিকে কুঁড়ি বিস্তার করে এবং চমৎকার দেখায়। বোধ হয় তোমরা এই আকারের প্রবাল অনেক স্থলে দেখিয়া থাকিবে। এই রূপে ডিম ছড়াইয়া, ফাটিয়া ও কুঁড়ি ফুটাইয়া একটী মাত্র প্রবাল অল্প সময়ের মধ্যে কত গুলির উৎপত্তি করে একবার ভাবিয়া দেখ। বস্তুতই এই কীটেরা যদিও আকারে অতি ক্ষুদ্র, তবু এইরূপ নানা উপায়ে এতই অসংখ্য কীট এক স্থানে জমা হয় যে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এইরূপে তাহাদের দেহ একত্র জমা হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ হইয়া রহিয়াছে।

প্রবাল কীট যখন মরিয়া যায়, তখন উহার শুঁড় গুলি ক্রমে পচিয়া গলিয়া পড়ে; ভিতরের অন্যান্য নরম অঙ্গও থাকে না। কেবল নিম্নের এই কঠিন আবরণটী মাত্র মাটি বা পাথরের গায় শক্ত হইয়া লাগিয়া থাকে। তখন উহার আকার নীচের ছবির মত দেখায়।

দেখ প্রবাল কীট জীবিত অবস্থায় যেমন সুন্দর, মরিলেও তেমনি সুন্দর; তবে মৃত্যুর পর পৃথিবীর কত উপকার হয় তাহা পরে বুঝিবে।

প্রবালকীটদিগের দ্বীপ নির্ম্মাণ বুঝিতে গেলে আগে নিম্নলিখিত মত তাহাদের কয়েকটী প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। বিশেষ মন দেওয়া চাই। (১) ইহারা অধিক শীতে বাঁচে না। যে সকল স্থানে খুব শীতকালেও অন্ততঃ ৬৮° ডিগ্রী উত্তাপ থাকে, সেই সব স্থানে ইহারা বাস করে। তাহাতে দেখা যায় যে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে প্রায় ৩০° ডিগ্রী (অর্থাৎ ২১০০ মাইল দূর) পর্য্যন্ত দুটী রেখা টানিলে তাহাদের মধ্যে যে ভূভাগ হয়, ইহারা তাহারই মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে, আরব ও পারস্য উপসাগরে এবং ভারত বর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত অংশেই ইহাদের খুব আধিপত্য। (২) ইহারা বেশী গভীর

জলে বাঁচে না। ৯০ ফিট গভীর জলেই তাহাদের সাধারণের জীবনের উপযোগী স্থান, কখন কখন ১২০ কি ১৮০ ফিট নিম্নেও বাঁচে, কিন্তু তাহার নীচে আর প্রবাল জীবিত থাকে না। (৩) নদীর মোহানার কাছে ইহারা থাকে না; কারণ ঘোলা জল ও লবণ শূন্য জল তাহাদের জীবনেব বিরোধী। (৪) ইহারা ঢেউ বড় ভাল বাসে এজন্য যেখানে ও যেদিকে সাগরের খুব তুফান বেশী, সেইখানে ও সেই দিকে খুব আনন্দে ইহারা বাড়ে। (৫) যেখানে জোয়ারের সময় জল উঠে না, তত্ উচ্চ স্থানে বাঁচে না অর্থাৎ ইহারা জলজন্তু; জল না পাইলে মরিয়া যায়। ক্রমশঃ।

রামকান্তের ঘোড়া।

রামকান্তের ঘোড়া!

পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তালপত্র সিপাই,
শুনেছত সকলেই, কভু দেখ নাই।
ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠে রামকান্ত বীর,
নবাবের মত বসে আনন্দে অস্থির!
ঘন ঘন কশাঘাত হেট হেট মুখে
লম্বা লম্বা পা দুখানি দোলাইয়া সুখে;
তোমরা অনেক ঘোড়া দেখিয়াছ সবে,
এমন মজার ঘোড়া কে দেখেছ কবে?
যেমন ঘোড়ার রূপ তেমনি সোয়ার,
ঠমকে ঠমকে চলে আনন্দ অপার।

রামকান্তের মাষ্টার।

সহসা পশ্চাতে কেহ কাণ পাকড়িল,
"কে রে" বলে রামকান্ত ফিরিয়া দেখিল;
দেখে সেই রুদ্রমূর্ত্তি ইস্কুলের ঘরে,
যাহার হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপে থর থরে;
উড়িল অর্দ্ধেক প্রাণ মুখে কথা নাই,
কাণ নিয়ে টানাটানি এবড় বালাই!
ইস্কুপের মত পেঁচ যত লাগে কাণে,
হাঁ করে রামকান্ত সেই টানে টানে।
সোয়ার পড়িল ধরা ঘোড়া দুইখান;
দ্রুতপদে দুইজনে করিছে প্রস্থান।
উলটি পালটি উঠি দুই শিশু ধায়,
ছট্ ফট্ রামকান্ত কাণের জ্বালায়।
হে শিশু! এরূপ ঘোড়া তুমি যদি চাও,
তবে কাণ মলে মলে কাণটা পাকাও।

নারীর বীরত্ব।

তোমরা হয় তো জান ইংরাজের পূর্ব্বে মুসলমানেরা আমাদের দেশের রাজা ছিলেন; তাঁহাদের রাজত্ব কালের কথা আজ তোমাদিগকে কিছু বলিব।—

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতনা বীর প্রধান স্থান। রাজপুতনার মধ্যে আবার মিবারে কত বীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন প্রদেশে এক সময়ে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। এখানে যুবা বীরত্ব দেখাইয়াছেন, রমণী গৃহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে শত শত যবন প্রাণ হারাইয়াছে; অনেক সময় শত্রুদিগকেও তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকাগণও আপনার দেশ হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে কত শত মহাত্মা আত্মত্যাগ, প্রভুভক্তি ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন!

উদয় সিংহ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বাল্য-জীবন আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। উদয় সিংহের পিতার নাম রাণা সঙ্গ (মিবারের রাজাদিগকে রাণা বলে)। রাণা সঙ্গ যখন মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে হত হন, তখন উদয় সিংহের বয়স ৪। ৫ বৎসরের অধিক হইবে না। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর তিন জন মিবারে রাজত্ব করেন; তৃতীয়ের নাম বনবীর, ইনি দাসী-পুত্র, ইহাঁর মিবারের সিংহাসনে কোন প্রকার অধিকার ছিল না। কিন্তু উদয় সিংহ নাবালক, তাই সকলে কয়েক বৎসরের জন্য বনবীরকে মিবারের সিংহাসন প্রদান করেন। প্রথমতঃ বনবীর রাজা হইতে অস্বীকার করেন কিন্তু শেষে নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হন।

বনবীর যে দিন মিবারের রাজা হইলেন সেই দিন হইতেই তাঁহার মনোমধ্যে কুবুদ্ধি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সততই চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করিলে তাঁহার সেই ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়, কি করিলে তিনি আজীবন রাজ-ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন। অনেক চিন্তার পর ঠিক করিলেন যে, রাণা সঙ্গের নাবালক পুত্র উদয় সিংহকে কোন প্রকারে বিনাশ করিয়া তাঁহার পথের কণ্টক দূর করিবেন।

একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় বনবীর তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে রাণা সঙ্গের পরিবারস্থ লোকদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন একজন চাকর যে গৃহে বালক উদয়সিংহ শয়ন করিয়াছিলেন তথায় প্রবেশ করিল, এবং শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা বলিল। ধাত্রী তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; কি প্রকারে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রাণা সঙ্গের বংশ রক্ষা করিবে ভাবিতে লাগিল। বালক উদয় সিংহ নিদ্রিত ছিলেন, এই বিপদের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। ধাত্রী ভৃত্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী ঝাঁকার ভিতরে নিদ্রিত বালককে রাখিয়া তদুপরি কতকগুলি আবর্জ্জনা

দিয়া ঝাঁকা ভৃত্যের মস্তকোপরি উঠাইয়া দিল এবং তাহাকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিল। ভৃত্য নিদ্রিত বালককে মাথায় করিয়া রাজ বাড়ীর বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ বালকের রাজ বাড়ীর মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এই ধাত্রীর নাম পান্না। উদয় সিংহের সমবয়স্ক পান্নার একটী পুত্র ছিল। ধাত্রী মিবারের রাজপুত্রকে এই প্রকারে চোরের মত গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া উদয় সিংহের বিছানায় স্বীয় পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিল। কিয়ৎকাল পরে বনবীর রক্তাক্ত কলেবরে তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বালক উদয় সিংহ কোথায় শুইয়া আছেন ধাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল মাত্র ইঙ্গিত করিয়া যে শয্যায় স্বীয় পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল তাহা দেখাইয়া দিল। উন্মত্ত, পাষণ্ড, নারকী বনবীর রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার আশায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া দাসী-পুত্রকে উদয় সিংহ মনে করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বিনাশ করিল। ক্ষমতা-প্রিয় রাজা এই প্রকার বিগর্হিত কার্য্যে বিষন্ন হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রফুল্লচিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

পাঠক পাঠিকাগণ! ধাত্রীর প্রভুভক্তির বিষয় তোমরা শুনিলে। এখন যাহার জন্য পান্না তাহার পুত্রকে হারাইল তাহার পরিণাম কি হইল তাহাই অতি সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বনবীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে পর দাসী স্বীয় হৃদয়ের ধন মৃত পুত্রকে লইয়া বাটীর বাহিরে গেল এবং কোন একস্থানে তাহার সৎকার করিয়া ভৃত্যের সঙ্গে গিয়া মিশিল। ধাত্রী এবং ভৃত্য উদয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া অনেক ভদ্রলোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্তু কেহই বনবীরের ভয়ে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে আশা শাহ নামক এক বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলে তিনি অগত্যা আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। পান্না যেখানে থাকিলে পাছে বনবীর উদয় সিংহের পলায়ন জানিতে পারে এই ভয়ে সে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে লাগিল।

উদয় সিংহ আশা শাহ বণিকের গৃহে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। মিবারের সৈন্য সামন্তগণ এবং ভদ্র লোক সকল উদয় সিংহের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন ঘটনায় বনবীরের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে সুযোগ পাইয়া বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থানে উদয় সিংহকে স্থাপন করিলেন। উদয় সিংহ ১৩ বৎসর বয়সে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মিবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু মিবার শাসনের উপযুক্ত গুণ তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন প্রকারে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলেন।

এই সময়ে আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে উদয় সিংহ পরাজিত হইয়া মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হন। তাঁহার জনৈক পত্নী মিবারের রাণা মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; আপনাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে ভৎর্সনা করিলেন এবং অবশেষে কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য মুসলমান যোদ্ধা সেই বীর-রমণীর অস্ত্রাঘাতে হত হইল; স্বয়ং আকবর সাহ

বীর-নারীর আসাধারণ যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হন। রাণা মুক্ত হইলেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠবীর আকবর সাহ একজন রাজপুত রমণীর নিকট পরাজিত হইলেন। আরও অনেকবার মুসলমানেরা রাজপুত রমণীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছেন।

আকবর সাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ভীরু উদয় সিংহ আকবরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া মিবার অরক্ষিত ছিল না; চতুর্দ্দিক হইতে রাজপুত নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া মিবার রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; মিবার বীর পরিপূর্ণ হইল। যে সকল বীর নানা স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পুত্ত ও জয়মল্ আশ্চর্য্য বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন। পুত্তের মাতা যবনদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় সন্তানকে আপন হস্তে যুদ্ধসজ্জায় সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন; পুত্রের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যে আপনার বংশ একেবারে লোপ হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করিলেন না। কেবল মাত্র সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইয়া মাতা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; নিজে পুত্রবধূ সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আরো অনেক মহিলা ছিলেন। অদ্য সকলে সুন্দর সুন্দর ভূষণ ও অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে কঠিন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন; সুকুমার শরীরে কঠিন লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। যাঁহারা কোন দিন গৃহের বাহির হন নাই তাঁহারা অগণিত যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক যবন বীর এই রমণীদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুতগণ মাতা স্ত্রী ও ভগিনীদিগের অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা আকবরের অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে রাজপুতদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া রমণীগণ স্বীয় স্বীয় অসিদ্বারা নিজ নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

তোমাদিগকে আর একটী কথা বলিব। এই যুদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ হত হইয়াছিলেন তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত একত্রে ওজন করিয়া ৭৪॥ মণ হইয়াছিল। তোমরা অনেকেই পত্রপৃষ্ঠে ৭৪॥ লিখিয়া থাক তাহার অর্থ এই—যে কেহ ঐ পত্র খুলিবে তাহার যতগুলি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত একত্র করিলে ৭৪॥ মণ হয় ততগুলি ব্রাহ্মণহত্যার পাপ হইবে।

নানা প্রসঙ্গ।

(১)

একটী ছোট দীপের নীচে একটী বড় দীপ ধর। ছোট দীপটী নিবিয়া যাইতে চাহিবে কেন, জান? দীপ জ্বলাতে অঙ্গারাম্ল নামক এক প্রকার বায়ু জন্মে সেই বায়ু প্রদীপের শিখার মুখ হইতে বেগে উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। বাতাসে অম্লজান নামক বায়ু আছে, তাহা আছে বলিয়াই

আগুন জ্বলিতে পারে। বড় দীপটী ছোট দীপের নীচে ধরিলে, তাহা হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু উঠিয়া ছোট দীপটীকে ঘিরিয়া ফেলে, আর বাতাসের অম্লজান আসিয়া তাহাকে জ্বালাইতে পারে না। কাজেই সে নিবিয়া যায়।

ছোট দীপটী নিবিয়া যাওয়া মাত্রই তাহার জ্বলন্ত পলিতাটী আনিয়া বড় দীপের নীচে (খুব কাছে, কিন্তু একটু ব্যবধান রাখিয়া) ধর; যেন, ছোট দীপের পলিতা হইতে যে ধূম এখনও বাহির হইতেছে তাহা বড় দীপটায় লাগিতে পারে। এখন দেখিবে বড় দীপ হইতে একটু আগুন নামিয়া আসিয়া ছোট দীপটীকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিবে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে পলিতা হইতে যে ধোঁয়া গিয়া বড় দীপটার গায় লাগিয়াছিল, তাহাতে এমন কিছু জিনিস ছিল যাহা জ্বলে। এই জিনিসটা পলিতার ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল; অত্যন্ত গরম লাগিলেই জিনিসটা বাহির হয়। এই জিনিসটা শূন্যে উঠিয়া যাইবার সময় জ্বলে, আর তাহাকে আমরা দীপের শিখা বলি। গরমে এই জিনিসটা বাহির হইয়া গেলে অনেক সময় আর কতগুলি জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহাকে আমরা অঙ্গার, ভস্ম ইত্যাদি নাম দিই।

কাঠের কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয় না, পাথর কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয়। যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, কাঠ জ্বলিবার সময়ই সেই জিনিসটা ফুরাইয়া গিয়াছে—তার পর কয়লা পাইয়াছ। কাজেই কাঠের কয়লায় সেই জিনিসটা নাই, আর তাহা জ্বলিবার সময় শিখাও দেখা যায় না। পাথর কয়লায় কিন্তু সেই জিনিসটা আছে, সুতরাং পাথর কয়লা জ্বলিবার সময় শিখা দেখা যায়। পাথর কয়লার এই পদার্থটা কৌশল ক্রমে বাহির করিয়া তাহা দ্বারা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হয়। তাহাকে তোমরা গ্যাসের আলো বল। পাথর কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা। কোক্ কয়লা হইতে পাথর কয়লার ন্যায় শিখা বাহির হয় না। তাহার কারণ এই যে, যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, তাহার অধিকাংশ অগ্রেই বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দুই পয়সা দিয়া সাহেবদের তামাক খাইবার একটা চীনা মাটির পাইপ ক্রয় কর। তাহার বাটীটার ভিতরে একখণ্ড পাথর কয়লা পূরিয়া বাটীর মুখ অতি উত্তম রূপে শিব গড়িবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেও। এখন সেই কয়লাপূর্ণ পাইপের মাথাটী আগুনে ফেলিয়া দেও, নলটী যেন আগুন হইতে বাহির হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে ঐ নলের মুখে আগুন দিলে সুন্দর গ্যাসের আলো জ্বলিবে।

এই গুলি তোমরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কেবল আমরা বলিতেছি বলিয়া ভাল মানুষের মত মানিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছোট দীপ আর বড় দীপের পরীক্ষাটী করিবার সময় দেখিবে যেন ছোট দীপটী বড় দীপ অপেক্ষা অনেক ছোট হয়, আর দীপগুলি যেন না কাঁপে।

---

(২)

অনেক দিন হইল একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আয়র্লণ্ড দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটী ছেলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নানা স্থানে লইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া সাহেব ঐ ছেলেটীকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিলেন।

সাহেব মদ খাইতে ভাল বাসিতেন সুতরাং পকেট হইতে একটী বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন; ছেলেটী মদ খাইতে চাহিল না। সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তোমাকে আট আনা দিব, তুমি খাও। সে খাইতে অস্বীকার করিল। তারপর সাহেব এক টাকা, তারপর ক্রমে দশটাকা দিতে চাহিলেন, ছেলেটী কোন মতেই মদ খাইতে রাজি হইল না। সে অতি গরিব ছেলে, তাহার গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু সে এত প্রলোভনেও বিচলিত না হইয়া পকেট হইতে একটী মেডেল বাহির করিল; সেটী মদ্যপাননিবারিণী সভার মেডেল। সেই মেডেলটী সাহেবকে দেখাইয়া বলিল "আমি মদ খাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার যত টাকা আছে তাহা সমস্ত দিলেও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না"। এই ছেলেটীর বাপ অত্যন্ত মদ খাইতেন; শেষে মদ্যপান নিবারিণী সভার যত্নে তিনি মদ খাওয়া ছাড়িয়া ভাল লোক হইয়াছিলেন। মরিবার সময় এই মেডেলটী তিনি ছেলেটীকে দিয়া গিয়াছিলেন। বালকের কথা শুনিয়া সাহেব মদের বোতল নিকটবর্ত্তী একটা পুকুরে ফেলিয়া দিলেন, এবং "নিজে আর কখনও মদ খাইব না" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাহাতে অন্যেরাও মদ না খায় সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

বেলুন।

চর্চ মাসের সখায় বেলুনের একটা ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে একটা নঙ্গর আঁকা ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন "ঐ নঙ্গরটা ওখানে কেন আসিল?"

নঙ্গরটা ওখানে নঙ্গরের কার্য্য করিতেই আসিয়াছে। নৌকার নঙ্গর জলে ফেলিলে নৌকা যেমন আর চলিতে পারে না, বেলুনের নঙ্গরও সেইরূপ! অনেক সময় বাতাসে ঠেলিয়া বেলুনটাকে এমন স্থানে লইয়া যাইতে চাহে যে বেলুনের আরোহী তাহা পছন্দ করেন না। তখন ঐ নঙ্গর নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া যদি নঙ্গরটাকে নিম্নস্থ কোন গাছ বা অন্য কিছুতে আট্‌কাইয়া দেওয়া যায় তবেই বেলুন আর চলিয়া যাইতে পারে না।

সম্প্রতি পারিস নগরে এক প্রকার বেলুন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে জাহাজের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেই খানে চালাইয়া নেওয়া যায়। এই বেলুনের আকৃতি ময়রার দোকানে যে চম্‌চম্ বিক্রী হয় তাহার ন্যায়। চম্‌চম্‌টাকে থালের উপরে যে ভাবে কাৎ করিয়া রাখে এই বেলুনও শূন্যে ঠিক্ সেই ভাবে থাকে। বাতাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময় যাহাতে বিশেষ বাধা না পায় তাহার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। এই চম্‌চমের এক মাথায় একটী হা'ল। আরোহীদের বসিবার দোলা চম্‌চমের গায় ঝুলিতেছে।

সেই দোলায় বেলুন চালাইবার কল। কলটী তাড়িতের বলে চলে। এই বেলুন চালাইতে তিনটী লোকের আবশ্যক। একজন হা'ল ধরে; আর একজন কল চালায়; আর একজন বালির বস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখে——অর্থাৎ বেলুন নামিয়া পড়িতে চাহিলে বালির বস্তা খালি করিয়া তাহাকে হাল্‌কা করে।

গরিলা।

আফ্রিকা দেশে গরিলার বাড়ী। গরিলারা বনে থাকে। সে সকল বনে মানুষের বড় একটা চলা ফেরা নাই। সভ্য লোকেরা তো সে স্থানে যাইতে চাহেনই না, সে দেশবাসী অসভ্যেরাও গরিলার ভয়ে সেই সকল বন হইতে দূরে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যদিগের মধ্যে হনুমান মহাশয় যেরূপ ছিলেন, সেদেশী জন্তুদের মধ্যে গরিলাও সেইরূপ। রামায়ণে হনুমানের কথা যাহা পড়িয়াছি তাহাতে তাহার উপর এক প্রকার ভাল ভাবই জন্মিয়াছে। আমি অনেক সময় ভাবিয়া থাকি যে হনুমান এত বড় লোক (থুড়ি, বড় বাঁদর) ছিলেন, কিন্তু হনুমান বলিলে আমরা এত চটি কেন? এ বিষয়ে হনুমান বেচারার একটু বিশেষ দুর্ভাগ্যই ছিল বলিতে হইবে, নতুবা হনুমান খাইয়াছেন বলিয়া কলার মৌথিক আদর কমিল কেন? মৌথিক বলিতেছি, কারণ খাইতে দিলে কাহারও যত্নের ত্রুটি দেখা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়টী আমার আলোচনার সামগ্রী নহে। আমি গরিলাদের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহাতে মনোযোগ দেও। আমি বলিতেছিলাম হনুমান খুব মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু গরিলা এত প্রধান জীব হইলেও তাহার আচার ব্যবহার গুলি ভাল নহে।

জাতিতে হুকু—নিবাস আফ্রিকা; এই দুই বিষয়ের মধ্যে বিশেষ আশাপ্রদ কিছুই নাই। এর পরেই চেহারা। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, আমরা মানুষ, সুতরাং আমরা সুন্দর, আর গরিলা হুকু, সুতরাং সে কুৎসিত। সুন্দরই হউক আর কুৎসিতই হউক, দেখিতে যে অত্যন্ত ভয়ানক সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গরিলা যে বনে বাস করে, সেই বনে এক প্রকার বাদাম জন্মে; এই বাদামই গরিলার প্রধান আহার। এই বাদাম এত শক্ত যে, একটা হাতুড়ি দিয়া খুব জোরের সহিত ঘা না মারিলে তাহাকে ভাঙ্গা যায় না। ইহারই আধ মণ ত্রিশ সের পরিমাণ অক্লেশে উদরস্থ করিয়া গরিলা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই বিষয়টী ভাবিলেই ইহাদের শরীরে যে কি ভয়ানক বল তাহা বুঝিতে পার। এর পর আবার তাহার স্বভাবটী। সেটী বাঘ ভল্লুকেরও অনুকরণের সামগ্রী। গরিলার দেশের লোকেরা তাহার নামেই ভয় পায়। ইহাদের উৎপাতের সম্বন্ধে বিস্তর গল্প বলা হইয়া থাকে। একবার নাকি এক দল গরিলাতে আর সে দেশের কতকগুলি

মানুষেতে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে গরিলারা জয়লাভ করিল, এবং কতকগুলি মানুষকে ধরিয়া লইয়া গেল। কয়েক দিন পরে এই লোকগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিল;—গরিলারা তাহাদের পায়ের আঙুল ছিঁড়িয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে!

সে দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে গরিলারা এক কালে মানুষই ছিল। কালক্রমে তাহাদের আচার ব্যবহার অধোগামী হওয়াতে তাহারা অসভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঘৃণাজনক আকার পাইয়াছে।

পুরুষ গরিলার হাতে অনেক সময় একটী ছোট মুগুর থাকে। সে দেশের লোকেরা বলে যে এই মুগুর লইয়া গরিলা হাতীর সহিত যুদ্ধ করে। তোমরা মনে করিতে পার যে হাতী নিরীহ ভাল-মানুষ, তাহার সঙ্গে গরিলার শত্রুতা হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু গরিলা মনে করে যে যথেষ্ট কারণ আছে। হস্তীর এক অপরাধ—গরিলা যাহা খায়, সেও তাহা খায়। হস্তীর বৃহৎ শরীর দেখিলেই গরিলা ভয় পায়, হয়ত মনে করে যে এত বড় জানোয়ারের আহারের পর তাহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই কারণেই সে হাতীর উপর এত চটা। এই কারণেই সে হাতী দেখিবামাত্র লাঠি হাতে তাড়া করে। প্রাণপণে হাতীর শুঁড়ের উপর একটী আঘাত করিলে আর দ্বিতীয় আঘাতের দরকার হয় না, হাতী ফ্যাঁ ফ্যাঁ শব্দ করিয়া পলায়ন করে।

সে দেশের লোকেরা হাতীর হাড় খুঁজিতে মাঝে মাঝে বনে যায়। তখন তাহাদের একটী ভয় বড়ই প্রবল থাকে—পাছে জঙ্গলে কখনও একটা গরিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গরিলা পথের ধারে গাছের পাতার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। দৈবাৎ কোন হতভাগ্য লোক যদি সেই পথ দিয়া যায়, তবে আর তাহার রক্ষা নাই। দুই পায়ে গাছের ডাল শক্ত করিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাছে তুলিয়া লয়, তাহার পরক্ষণেই দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড বলের সহিত তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরে আর তাহার পাঁজর চূর্ণ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

মাঝে মাঝে কেহ কেহ গরিলা মারিতে চেষ্টা করেন। এক গুলিতে যদি গরিলা মরিল, তবে ভালই। কিন্তু যদি গুলি খাইয়াও তাহার শরীরে প্রাণ থাকে, তবেই বিপদ। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একবার একটা গরিলা মরিবার সময় একটা বন্দুকের নল বাঁকাইয়া এবং দাঁতে চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিয়াছিল।

দুশেলু নামক এক সাহেব গরিলার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, তিনি প্রকাণ্ড এক গ্রন্থে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প লেখা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদিগকে তাহার দুই একটার অধিক উপহার দিতে সাহস পাইতেছি না। উইনউড্-রীড্ নামক এক সাহেব দুশেলুর কিছু পরে আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। দুশেলুর কথাগুলি কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করেন। দুশেলুর পুস্তকে যে সকল লোকের উল্লেখ আছে, তিনি তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের সহিত এ সম্বন্ধে অনেক আলাপ করেন; তাহাতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, দুশেলুর সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। রীড সাহেব গরিলার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া তারপর গরিলা সম্বন্ধে দুই একটী গল্প বলিয়া আমরা শেষ করিব।

ক্রমশঃ।

মাতার প্রশ্ন।

সরোজিনী আর বিজয় প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে তাহাদের মার নিকট গল্প শুনিয়া থাকে। তিনিও গল্প বলিতে ভাল বাসেন; কিন্তু প্রত্যেক গল্প শেষ হইলেই তাহা-দিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আজ আগ্রহের সহিত মাতা তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ছোট ছোট দুইটী গল্প বলিতেছি, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর ঠিক চাই, নতুবা আর গল্প শুনিতে পারিবে না।

প্রথমটী শুন:—রামা বলিয়া একটী ধূর্ত্ত শেয়াল মধুপুরের বনে বাস করিত। তাহার একটী ছোট ভাই ছিল; সে অত্যন্ত ধার্ম্মিক। এক দিন দুই ভাই শিকারে বাহির হইল, ছোট ভাই একটী পাখী ধরিল, কিন্তু বড় ভাই কিছুই পাইলেন না। রামা একটু লজ্জিত হইল কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া উঠাতে মনে মনে ভাবিল "কোন মতে চালাকি করিয়া পাখীটি লইতে পারিলে আমার খোরাকের যোগাড় হয়।"

শেয়ালদের মধ্যে একটী বেশ নিয়ম আছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে সকলকেই তাহাদের গুরুর নাম করিয়া আটবার প্রণাম করিতে হয়। রামা দেখিল যে তাহার ছোট ভাই সে দিন গুরুর নামে প্রণাম করে নাই, সুতরাং তাহার পুরোহিতের নিকট নালিস করিলে পাখীটি সে পাইতে পারে।

ঘটনাক্রমে পথেই পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামা তৎক্ষণাৎ তাহার নালিস রুজু করিল। ছোট ভাই পাখীটি মাটিতে রাখিয়া, মৃদুস্বরে বলিল "আমি বাড়ী যাইয়াই প্রণাম করিব।" পুরোহিতও "এত দেরীতে," "এত দেরীতে" বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র, রামা পাখীটি মুখে ধরিতে গেল। কিন্তু পুরোহিত মুখভঙ্গি করিয়া রামাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাপু হে, তুমি কখন প্রণাম করিয়াছ, শুনি?"

উপরের দিকে চাহিয়া রামা বলিল "কি বলেন মশাই, আমি কি কখন ভুলি; রাত্র শেষ না হতেই আমি প্রণাম করিয়াছি।" "এত শীঘ্র," "এত শীঘ্র" বলিয়া পুরোহিত আবার চীৎকার করিল এবং বলিল "তোমরা দুজনের কেহই পাখীটি পাইতে পার না, কারণ যথা সময়ে কেহই উপাসনা কর নাই; অতএব ইহা পুরোহিতের প্রাপ্য;" এই বলিয়া পুরোহিত পাখীটি লইয়া চলিয়া গেলেন। রামারা দুই ভাই বোকা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

বিজয়, বল দেখি গল্পটী শুনিয়া কি উপদেশ পাইলে?

বিজয়। "অতি চালাকের গলায় দড়ি।" রামা যদি সরল মনে পাখীর ভাগ চাহিত, তবে ছোট ভাই, বড় ভাইকে না দিয়া কখনই খাইত না। আমার মতে মনের ভাব সরলভাবে জানান উচিত; কখন প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া, কাজ করা উচিত নয়।

মাতা। বেশ; সরো বল।

সরোজিনী। নিজে পাপী অথচ পরের পাপ বাহির করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া পাগলের কার্য্য। রামার এটা বুঝা উচিত ছিল যে, সে নিজে দোষী, নালিস করিলে তাহার পাওয়ার কি অধিকার? তারপর ছোট ভ্রাতার উপর ভালবাসা দূরে থাকুক, এমন দ্বেষ! আমি তো বিজয়ের উপর এমন নীচ, জঘন্য ভাব কখনও প্রকাশ করি নাই; ঈশ্বর না করুন কখন করিবও না।

মাতা। উত্তর ঠিক্ হইয়াছে। আর একটী শুনঃ—বেলা শেষ হইয়াছে। সূর্য্য তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া বিদায় লইবার জন্য পশ্চিমে গিয়াছেন; এদিকে চন্দ্র তাহার কার্য্য করিবার জন্য পূর্ব্বে উদয় হইতেছেন। এমন সময় সূর্য্য গম্ভীর ভাবে চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"আচ্ছা বল দেখি লোকে তোমার প্রতি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কেন? সমস্ত দিন আমি পরিশ্রম করিয়া কিরণ প্রদান করি এবং শীত কালে, শীত বিনাশ করি; রাত্রের আঁধার নষ্ট করিয়া লোকজনের কত সুবিধা করি, তথাপি তুমি যখনি তোমার ঐ মুখ খানি প্রকাশ কর অমনি পৃথিবীর সকলেই গীত গাইয়া তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে।"

চন্দ্র বলিল ভাইঃ—"তোমার কীর্ত্তি চোখের উপর রহিয়াছে এবং তুমি দিনের বেলাই জীবের উপকার কর। আমি ভাই অতি সামান্য কার্য্য করি এবং যা কিছু করি তাহা অতি অল্প লোকেই জানে।"

"তথাপি লোকে তোমাকেই প্রশংসা করিবে।" এই বলিয়া সূর্য্য রাগান্বিত হইয়া, চক্ষুলাল করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

বলত এ গল্প হ'তে কি উপদেশ পাইলে?

বিজয়। চন্দ্র নিজের কার্য্যের প্রশংসা চায় না, তাই লোকে তাহার প্রশংসা করে। আর সূর্য্য যদিও চন্দ্র অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী উপকার করেন, তথাপি তাহার লালমুখ দেখিয়া কেহই প্রশংসা করে না। যে নম্র এবং বিনয়ী সে সকল স্থানেই আদর পায়।

সরোজিনী। তাইত; যদি কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অভিলাষ থাকে, তবে নীরবে এবং বিনয়ের সহিত কার্য্য করাই উচিত। কেনা জানে যে চন্দ্রের গৌরব সূর্য্য হইতে, তথাপি বড়কর্ত্তা আদর পান না আর তাঁর ভৃত্য সকলের নিকট পূজনীয়। মিষ্ট মুখে শাক দিলেও মহা আদরে লইতে ইচ্ছা করে, আর কটুমুখে ক্ষীর সর দিলেও, তাহা পদাঘাতে দূরে ফেলিতে ইচ্ছা করে।

মাতা। তোরা যদি বেঁচে থাকিস্ তবে মানুষ হবি।

ফুলের সাজি।

প্রথম অধ্যায়।

পিতা ও কন্যা।

ননাথ নামে এক দরিদ্র বালক হিন্দুদিগের রাজত্ব কালে গৌড় নগরের নিকট প্রসাদপুর গ্রামে বাস করিত। সে অতি শিশুকালে কৃষি ও উদ্যান কার্য্য শিখিবার জন্য রাজধানী আগমন করিয়া গৌড় রাজের প্রমোদ কাননে একটী সামান্য মালির কার্য্য পাইয়াছিল। সুচরিত্র, কার্য্য-পটুতা এবং অমায়িকতা গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজা ও রাজ্ঞীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজা যেখানে যাইতেন দীননাথকে তাঁহার সঙ্গে লইতেন। এই রূপে রাজার সহিত নানা দেশে ও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কিরূপে ভদ্র সমাজে কথা বার্ত্তা কহিতে হয়, কিরূপ রীতিতে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা দীননাথ উত্তম রূপে শিখিয়াছিল। অনেক দিন রাজসংসারে অকলঙ্কিত অবস্থায় কাটাইলে মহারাজা তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহা-

কে কোন উচ্চপদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে সে মনে করিলে গৌড় রাজার ভাণ্ডার-রক্ষক হইতে পারিত; কিন্তু সাধু দীননাথ রাজধানীতে উচ্চপদ লাভ করিতে ইচ্ছা না করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ভৃত্যপ্রিয় রাজা বিনা খাজানায় তাহাকে একটী গ্রামের পত্তনীদার করিলেন। এবং প্রতি বৎসর তাহার প্রয়োজনীয় শস্য ও কাষ্ঠ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রাজদত্ত উপহার পাইবার কিছুপরে সে জ্ঞানদা নামে কোন সচ্চরিত্র রমণীকে বিবাহ করিল। তাহার যাহা আয় ছিল তাহাতে তাহাদের সকল অভাবই পূর্ণ হইল। যাহার মনে দুরাকাঙ্ক্ষা ,তাহারই অধিক কষ্ট; স্পৃহাহীন দীননাথ আপনার অবস্থাতে পরম পরিতুষ্ট ছিল বলিয়া তাহার কোন ক্লেশ ছিল না। ভিতর বাড়ীতে চার খানি মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ। দীননাথের পত্নী প্রতিদিন আপনি ঐ সকল গৃহ মার্জ্জনা করিতেন; তাঁহার জন্য উঠানে একটি কুটাও পড়িতে পাইত না। দেয়াল গুলি গোময় ও মৃত্তিকা লেপনে চক্ চক্ করিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, সকল দ্রব্যই পরিষ্কার ভাবে সাজান আছে। জ্ঞানদা সামান্য খড়িকাকেও যথাস্থানে রক্ষা করিত। পল্লীগ্রামে ধনী,নির্ধন প্রায় সকলেরই শয্যা অতিশয় মলিন,কিন্তু জ্ঞানদা শয্যাগুলি নিজে কাঁচিয়া পরিষ্কার করিত। বাহির বাড়ীতে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ খানির পাশে একটী পরিষ্কার কাম্‌রা ছিল, এই চণ্ডীমণ্ডপ খানি অতি পরিষ্কার। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটী উঠান, উঠানে বেল, মল্লিকা, যুই, গোলাপ, গন্ধরাজ, রজনী গন্ধ প্রভৃতি ফুলের গাছ।

দীননাথ এই সকল গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখিত ও গ্রীষ্ম কালে প্রতিদিন গাছের গোড়ায় জল সেচন করিত। ফলতঃ বাড়ী দেখিলে বুঝা যাইত যে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী সুরুচি সম্পন্ন। খিড়্‌কিতে বেশ একটী বাগান, বাগানের অর্দ্ধভাগে ভাল ভাল, আম, নারিকেল, কাঁঠাল, নিচু, গোলাপ জাম প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের গাছ রোপিত ছিল, তাহাদের ফলও প্রচুর পরিমাণে হইত। বাগানে একটী ঘাট বাঁধান পুস্করিণী, পুস্করিণীর ধারেও কতকগুলি ফলের গাছ ছিল। বাগানের অপর অংশে দীননাথ নিজ হাতে শাক শব্‌জি করিত। এইরূপ পল্লীগ্রামে দীননাথ পত্নীর সহিত পরমসুখে কাল কাটাইত।

ভাগ্য চিরকাল সমান থাকে না। দীননাথের পত্নী জ্ঞানদা কিছুদিন সুখে গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করিল। স্ত্রীর বিয়োগে তাহার যে গুরুতর শোক হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনোরমা নামে একটী কন্যা ব্যতীত বৃদ্ধের আর কেহই ছিল না। তাহার পত্নীর অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র মনোরমাই জীবিত ছিল। আর সকলে শৈশবেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; মনোরমার আকার তাহার মার ন্যায়। বাল্যকালে মনোরমা অতিশয় সুশ্রী ছিল; যত তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, বিনয়, সততা ও দয়াগুণে ভূষিতা হইয়া বালিকা আরও সুন্দর হইতে লাগিল। তাহার পিতাও তাহাকে প্রাণের সহিত স্নেহ করিতে লাগিল। বালিকাও পিতাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না। সে ফুল বড় ভাল বাসিত, ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিলে বিমুগ্ধ হইত। এখন মনোরমার তের বৎসর বয়স, এই সময়েই তাহাকে তাহাদের বাড়ীর সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। তাহার মার মত সেও ঘরগুলি পরিষ্কার রাখিত; তাহার ঘর গুলি ঝর্ ঝরে,বাসন

গুলি পরিস্কার এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হইত। মনোরমা তাহার পিতার সঙ্গে উদ্যানে কার্য্য করিত, বাগানের কাজ করিতে সে কখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত না। যে সময়ে সে পিতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, সে সময়ে দীননাথ নানা প্রকার চমৎকার গল্প বলিত বলিয়া, মনোরমা পরিশ্রম করিয়া ক্লেশ বোধ করিত না। কখন কখন সে গল্প শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হইত যে পিতা কখন বাগানের কাজ করিতে ডাকিবেন তাহারই অপেক্ষা করিত। মনোরমা বাল্য কাল হইতেই বৃক্ষ লতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে শিখিয়াছিল। কোন স্থানে একটী নূতন চারা বা ফুল দেখিলে মনোরমার উল্লাসের আর সীমা থাকিত না। দীননাথ তাহার কন্যার এই মনোগত ভাব বুঝিয়াছিল; এবং প্রতিবৎসর নানা স্থান হইতে মনোরমার জন্য নূতন গাছ, বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিত। একটী নূতন চারা রোপিত হইলে, মনোরমা প্রতিদিন তাহাতে জল সেচন করিত এবং প্রতিদিন সেই চারাটী কতদূর বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিত। গাছে কুঁড়ি ধরিলে কবে ফুল ফুটিবে সতৃষ্ণ চক্ষে তাহারই অপেক্ষায় থাকিত। আহা! যখন, হরিত বর্ণ গাছ গুলিতে ফুল দেখা দিত তখন মনোরমার আহ্লাদ আর দেখে কে? একদিন দীননাথ কহিল "মনোরমে, বাগানের কাজ কত চমৎকার, ইহার ন্যায় পবিত্র ও নির্দ্দোষ আমোদ আর নাই, লোকে কত দাম দিয়া তাহাদের পুত্র কন্যার জন্য কাপড় ও গহনা কিনিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহাদের অনেক অল্প ব্যয়ে তোমায় নূতন নূতন চারা ক্রয় করিয়া দি। বল দেখি, তাহাদের পুত্র কন্যারা অধিক আনন্দ পায়, না তুমি অধিক পাও।"

সে বলিল, "বাবা, কাপড় বা গহনায় এত আমোদ নাই, যখনই একখানা ভাল নূতন কাপড় পরা যায় তখনই একটু আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু সে আহ্লাদ অধিকক্ষণ থাকে না। কিন্তু একটী চারা অল্প মূল্য দিয়া বাগানে বসাইলে নিত্য নূতন আমোদ। বাবা! বলিতে কি জগতের আর কোন আনন্দই ইহার সহিত তুলনা হয় না।"

দীননাথ কন্যার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ক্রমশঃ।

ধাঁধা।

গত মর্চ্চ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মনুষ্য।

—o—

নব বর্ষের ধাঁধা।

—:o:—

সখা
চতুর্থ ভাগ। ষষ্ঠ সংখ্যা।
জুন, ১৮৮৬।

কলের জাহাজ।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় কলের জাহাজ দেখিয়াছ; এবং কেহ কেহ হয়ত কলের জাহাজে চড়িয়াছ। কিন্তু কে কোথায় এবং কবে প্রথমে ইহার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সংবাদ বোধ হয় অনেকেই রাখ না। আমরা এই প্রবন্ধে সেই বিষয় তোমাদিগকে কিছু বলিব।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশে কলের জাহাজের উদ্ভাবন কর্ত্তা রবার্ট ফুল্টনের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকিতে ও নানা রকমের কল প্রস্তুত করিতে ভাল বাসিতেন; কিন্তু প্রথম প্রথম ছবি আঁকিয়াই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। তখনকার প্রসিদ্ধ চিত্রকর মেঃ ওয়েষ্টের নিকট হইতে ভালরূপে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং সেইখানে থাকিবার সময়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলের জাহাজ চালাইবার একটী উপায় মনে মনে বাহির করেন। তখন তাঁহার বয়স আটাইশ বৎসর মাত্র। তাহার পর হইতে তিনি অবসর পাইলেই এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতেন। তের বৎসর কাল এইরূপে কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সেও গিয়াছিলেন। ফ্রান্সে তখন প্রথম নেপোলিয়ন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই দেখিয়া, ১৮০৬

খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফুল্টন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় তিনি ব্রিজওয়াটারের ডিউককে খাল কাটাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী সম্বন্ধে পরামর্শ দেন এবং মারবল প্রস্তর চিরিবার জন্য এক কলের করাত, ছাল্‌টির সূতা পাকাইবার ও কাছি প্রস্তুত করিবার কল, এবং যুদ্ধের সময় বিপক্ষদিগের জাহাজ বিনষ্ট করিবার জন্য এক প্রকার টরপিডো প্রস্তুত করেন।

সে যাহা হউক ঠিক্ কোন্ সময়ে যে বাষ্পের বলে জাহাজ চালাইবার কথা প্রথমে ফুল্টনের মনে উদয় হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মনে মনে যে পন্থা স্থির করেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে কিছু চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মেঃ লিভিংষ্টন নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্কের পার্লিয়ামেণ্ট হইতে এই অনুমতি পান যে, যদি তিনি এক বৎসরের মধ্যে এমন একখানি পোত প্রস্তুত করিতে পারেন যাহা বাষ্প বা আগুনের বলে ঘণ্টায় অন্ততঃ চারি মাইল করিয়া চলিবে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে কুড়ি বৎসর কাল নিউইয়র্কের অধীনস্থ নদী সাগরাদিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ ঐরূপ পোত চালাইবার অধিকার পাইবে না। যখন লিভিংষ্টন প্রথমে এই প্রার্থনা করেন তখন যিনি নিউইয়র্কের পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাকে যে কত উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু লিভিংষ্টন প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার পর লিভিংষ্টন ইউনাইটেড্ ষ্টেটের প্রতিনিধি স্বরূপে ফ্রান্স গমন করেন। সেইখানে ফুল্টনের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উভয়ের উদ্দেশ্য এক বলিয়া ক্রমে এই আলাপ বন্ধুতায় পরিণত হইল এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া পুনরায় ঐ বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন। ফুল্টনের উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফুল্টন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই তিনি ৮৬ হাত দীর্ঘ, ১২ হাত প্রশস্ত ও ৫ হাত উচ্চ একখানি প্রকাণ্ড নৌকা গঠন আরম্ভ করিলেন। নৌকা কতক প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধুতে দেখিলেন যে তাঁহারা যত মনে করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ চাই। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কারবারের এক তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সকলেই মনে করিয়াছিল যে তাঁহাদের কলের জাহাজ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, এই জন্য কেহ সাহস করিয়া অংশ কিনিতে অগ্রসর হইল না। সে যাহা হউক ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ঈষ্ট রিভার (পূর্ব্ব নদী) নামক নদীতে এই বৃহৎ পোত ভাসান হইল। তাহার পর তাহার উপর বাষ্পীয় কল খাটান হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে অনেকে কোনরূপ বাষ্পীয় কলই দেখে নাই। তাহারা হাঁ করিয়া এই সমস্ত কাণ্ড দেখিতে লাগিল। ক্রমে কল বসান শেষ হইল। জাহাজের দুই পার্শ্বে প্রায় ৩১ হাত পরিধি বিশিষ্ট দুই চাকা ঝুলান হইল; তাহাতে জল টানিবার জন্য সারি সারি তক্তা লাগান। লোকে সন্দেহ মিশ্রিত কৌতূহলের সহিত এই মহা ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। পরে যখন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় নূতন কলের জাহাজ ক্লারমণ্ট, নিউইয়র্ক নগরের কর্টল্যাণ্ড

ষ্ট্রীটের নিকট হইতে আরোহী লইয়া দেড় শত মাইল দূরস্থিত আলবানি নামক স্থানে যাত্রা করিবে, তখন সকলেই অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে হাসিতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, ঐ জাহাজে করিয়া আলবানি যাইতে সম্মত হইতে পারে এমন নির্ব্বোধ কেহ আছে কি না?

মানুষ সহজে কোন একটা নূতন ব্যাপারে হাত দিতে চায় না। কলম্বস যখন প্রথমে আট্‌লাণ্টিকের পরপারে গিয়া স্থল আবিষ্কার করিবার কথা উত্থাপন করেন তখন লোকে তাঁহাকে কতই না উপহাস করিয়াছিল; সাহায্যের জন্য তাঁহাকে কত দেশ বিদেশেই না ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় সপ্রমাণ হইল, কলম্বসের ভুল কি তাঁহাকে যাহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল তাহাদের ভুল। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে কেবল কলম্বসের নাম করিলাম। কিন্তু ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা নূতন কিছু বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় অনেকেই অপরের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে বিপক্ষতা ও উপহাস ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্টভোগ করিয়া তবে তাঁহারা আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলের জাহাজের উদ্ভাবক ফুল্টনের বেলাও তাহাই হইয়াছিল। ক্লারমণ্ট নামক কলের জাহাজ প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার উপর আবার সাধারণের উপহাস। তাঁহার অতুল অধ্যবসায়ের শেষ ফল কি হইল তাহা আমরা পরে পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইব।

গরিলা।

হুশেলু সাহেব নিম্ন লিখিত গল্পটী বলিয়াছেন।—"আমরা একটা অন্ধকারময় উপত্যকার দিকে চলিলাম। গ্যাম্বো (হুশেলুর আফ্রিকা দেশীয় ভৃত্য) বলিয়াছিল, সেখানে শীকার (গরিলা) মিলিবে। * * * আমাদের দলের লোকেরা পৃথক হইয়া চলিল। গ্যাম্বো আর আমি একত্র থাকিলাম। একজন সাহসী লোক একা একদিক পানে চলিল, সে মনে করিয়াছিল সেই দিকে গেলে গরিলা পাওয়া যাইবে; অবশিষ্ট তিন জন অন্য এক দিকে চলিল। এইরূপে পৃথক হইয়া আমরা একঘণ্টা কাল ছিলাম, এমন সময়ে গ্যাম্বো আর আমি আমাদের অতি অল্পদূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনিলাম। তার পরক্ষণেই আর একটা আওয়াজ হইল। আমরা অবিলম্বে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলাম; আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একটা মরা গরিলা দেখিতে পাইব। এই সময়ে ভয়ানক শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্যাম্বো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আমার বাহু ধরিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, মনে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বেশী দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, আমরা যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই হইয়াছে। যে বেচারা সাহস করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে সেই স্থানে পতিত দেখিলাম। তাহার রক্তে সেইস্থান ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথমে বোধ হইয়াছিল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার নাড়িভুড়ি পেট ফাটিয়া বাহির হইয়া

পড়িয়াছে। পাশেই বন্দুকটা পড়িয়া আছে---বন্দুকের কাঠের অংশটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নলটা চ্যাপ্টা হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। গরিলার দাঁতের দাগ তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমরা তাহাকে তুলিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার ঘায় পটি বাঁধিয়া দিলাম। একটু ব্রাণ্ডি খাইতে দিলে পর তাহার চৈতন্য হইল —অতি কষ্টে সে কথা কহিতে লাগিল। সে বলিল যে হঠাৎ সে গরিলাটার সামনে পড়িয়া গিয়াছিল; তখন সেটা পলাইতে চেষ্টা করে নাই। সেটা একটা মস্ত পুরুষ গরিলা; দেখিতে ভয়ানক হিংস্র বলিয়া বোধ হইল। জঙ্গলের সে স্থানটা অন্ধকার ছিল, বোধ হয় অন্ধকারের জন্য তাহার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই। সে বলিল যে সে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক সন্ধান করিয়াছিল, এবং কেবল মাত্র আটফিট দূর হইতে গুলি করিয়াছিল। গুলিটা এক পাশে লাগিয়াছিল। গুলি খাইয়াই সেটা বুক চাপড়াইতে লাগিল আর ভয়ানক রাগিয়া তাহার দিকে আসিতে লাগিল। দৌড়িয়া পালান তখন অসম্ভব, দশ পা যাইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। সে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় বন্দুক ভরিল। পুনরায় গুলি করিবার জন্য যেই সে বন্দুক উঠাইতেছিল, অমনি গরিলাটা তাহার হাত হইতে সেটাকে কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। পড়িবার সময় সেটা ছুটিয়া গেল। তারপর ভয়ানক শব্দ করিয়া সেই জানোয়ারটা তাহার পেটে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই পেট কাটিয়া নাড়িভুড়ির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রক্তাক্ত শরীরে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। গরিলাটা তাহাকে ছাড়িয়া বন্দুকটাকে ধরিল—ইহা দেখিয়া সে বেচারা মনে করিল যে বুঝি বন্দুক দিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু গরিলা বোধ হয় সেটাকেও শত্রু মনে করিয়াছিল—সুতরাং সে তাহাকে দাঁতে চিবাইয়া চ্যাপ্টা করিয়া দিল।"

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"আমরা নিঃশব্দে যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর তখনই একটা স্ত্রী-গরিলাকে দেখিলাম। একটী অতি শিশু গরিলা তাহার বুকে ঝুলিয়া দুধ খাইতেছে। মাতা তাহার পিঠ চাপড়াইতেছিল আর স্নেহের সহিত তাহাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া আমার এত ভাল বোধ হইল এবং আমার প্রাণে এত লাগিল যে আমি সহসা গুলি করিতে চাহিলাম না। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় আমার সঙ্গের একজন শীকারি তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, সেটা অমনি পড়িয়া গেল। মাতা পড়িয়া গেলে ছানাটী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল আর চীৎকার করিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। আমি সেই স্থানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া বেচারা তাহার মায়ের বুকে মাথা লুকাইল। ছানাটী চলিতেও পারিত না; কামড়াইতেও শিখে-নাই; সুতরাং আমরা সহজেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম। আমি সেটীকে লইয়া চলিলাম; সঙ্গের লোকেরা তাহার মায়ের শরীরটা বাঁশে করিয়া বহিয়া আনিল। যখন আমরা গ্রামে আসিলাম, তখন আর এক দৃশ্য দেখা গেল। লোকেরা মরা গরিলাটাকে মাটিতে রাখিল, আমি ছানাটীকে কাছে রাখিলাম। তাহার মাকে দেখিবামাত্র সে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে গেল এবং দুধ খাইতে চেষ্টা করিল। দুধ না পাইয়া হয়ত মনে করিল যে একটা কিছু

হইয়াছে। তখন সে অতিশয় দুঃখের সহিত 'হু হু হু'! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল। সে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিত না, আমিও দুধের যোগাড় করিতে পারিলাম না। সুতরাং দুইদিন পরে বেচারা মরিয়া গেল।" পশুদের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার! সখার পাঠক পাঠিকা শুনিয়া হয়ত তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিতেছে। ঘৃণা জন্মিবারই কথা।

ভিখারিণী মেয়ে।

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায়।
কে গাইছে পথে বসি এমন সময়—
না না না আমারি ভুল, গান ও তো নয়;
আপন প্রাণের ব্যাথা ক'য়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে!

২

কত দুখে—আহা রে! না জানি
শুকায়েছে সোণামুখ খানি!
ছেঁড়া বাস যুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কত দিন তেল বুঝি মাখেনি মাথায়!
আমার স্নেহের ভাই বোন!
কি ব'লে সে কাঁদে ঐ শোন।

৩

"এ জগতে কেউ মোর নাই
আমি হায় ভিখারিণী তাই;
লোকের দুয়ারে যাই ভিক্ষা দে'মা' ব'লে,
ঘর নাই, তাই রেতে থাকি তরুতলে!
কিছু আর নাহিক সম্বল
সবে ধন নয়নের জল।

৪

"ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
এ দুখিনী নীরবে তাকায়;
ঘৃণা করে পাছে, ভেবে কথা বলি নাই,
তারা কেউ নয় মোর আপনার ভাই!—
তাই তারা আমাকে ডাকে না,
মোর কথা ভুলেও ভাবে না!

৫

"ত্রিসংসারে কে আছে আমার
কে মোরে ভাবিবে আপনার
আপনা আপনি কাঁদি, কেউ নাহি শোনে,
আমারে জগতে বুঝি কেউ নাহি চেনে!
এ দেশে তো এত আছে লোক
মোর তরে কেবা করে শোক?"

৬

"হায় বিধি, আমার কপালে
মরণ আছে কি কোন কালে?—
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মাও গেছে, চলে
একা আমি পড়ে আছি এত সব ব'লে;
ধনী, গুণী তাড়াতাড়ি মরে
আমাদের যমেও না ধরে!

৭

"তিন দিন ভাত নাই পেটে
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে!

আকাশে উঠিছে মেঘ, উড়িছে পরাণ;
যদি আসে ঝড় জল, কোথা পাব স্থান?
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি!
আজি যেন একেবারে মরি।

৮

"দারুণ দুঃখের জ্বালা সয়ে
বেঁচে আছি আধ-মরা হয়ে,
এখন বাসনা শুধু মরণ মরণ!
মরণের কোলে থাকি করিয়া শয়ন।
এ জগতে কেউ যার নাই
মরণ! তুমি রে তার ভাই!" !!

৯

কচি মুখে এ বিষাদ গান
শুনে কার ফাটে না পরাণ!
বালক বালিকা আয় মোরা ছুটে যাই,
দুঃখিনীর আঁখি জল যতনে মুছাই;
ওরে যার দয়া নাহি হয়,
কেনরে সে দেহ ভার বয়!

১৯

চল চল ওর হাত ধরে
আমরা আনি গে ডেকে ঘরে;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই
কেউ হব বোন মোরা, কেউ হব ভাই
তাহ'লে ও বেদনা ভুলিবে;
তাহ'লে ও কতই হাসিবে!

নানা প্রসঙ্গ।

নং ১

দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল।

প্রত্যেক একটা জানোয়ারের এক এক প্রকার দুর্ব্বলতা থাকে। একজন শুনিল যে গায়ের পিরাণ খুলিয়া ফেলিবার মতন করিয়া পা উল্টাইয়া মাথার উপর পর্য্যন্ত আনিয়া, তার পর মাথা নোঙাইয়া পেছনের দিকে হাঁটিয়া কুকুরের কাছে গেলে বড় ভয়ানক কুকুরটাও ভয় পায়। এই ব্যক্তির প্রতিবেশীর একটী সুন্দর ফলের বাগান ছিল। প্রতিবেশী অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিল। তাহার বাগানের দরজায় আবার এক প্রকাণ্ড কুকুর বাঁধা থাকিত। সুতরাং ফলগুলি দেখিয়া তাহার ক্ষুধাই বাড়িত, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি হইবার কোন আশা ছিল না। সে কুকুর সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়াই ভাবিল যে এইবার প্রতিবেশীর ফলের বাগানে যাইতে হইবে। যাহা ভাবিল, কাজেও তাহাই করিল। আস্তে আস্তে কুকুরের দিকে পশ্চাৎপাদ হইতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল বুঝি কুকুর পলাইয়াছে—বুঝি এইবার বাগানের ভিতর আসিয়াছি। কুকুর কিন্তু ভয় পায় নাই; তাহার গলায় বাঁধা শিকলটা লম্বা ছিল না বলিয়া সে এতক্ষণ চুপ্ মারিয়াছিল। উল্টোদিকে উল্টোদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে যাই ইনি তাহার কাছে আসিয়াছেন, অমনি সে ইঁহার পাছা হইতে একবারের জলযোগের মতন এক টুকরা মাংস কামড়াইয়া লইল।

অন্যায় কাজ করিতে গেলে তাহারই শাস্তি পাওয়া যায়।

নং ২

আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

একজন স্পানিয়ার্ড আফ্রিকা দেশে পাখী মারিতে গিয়াছিল। পাখী শীকার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা সিংহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুরাজের মুখভঙ্গী দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে কেবল মাত্র কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার আগমন হয় নাই। তাহার বন্দুক পাখী মারিবার জন্য প্রস্তুত করা ছিল। ইহা ভিন্ন আর গুলি বারুদ তাহার সঙ্গে ছিল না। গুলি করিলে সিংহ মরিবে না, কেবল মাত্র বিপদ বাড়িবে। সুতরাং সে অন্য উপায়ে রক্ষা পাইবার পথ দেখিতে লাগিল। তাহার মাথার টুপিতে অনেকগুলি উটপক্ষীর পালক বাঁধা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে টুপী মুখে করিয়া লইল। পালকগুলি কেশরের মতন হইয়া তাহার বুক মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে চক্ষু দুটী মিট মিট করিতে লাগিল। এইরূপ চেহারা করিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সিংহের দিকে যাইতে লাগিল। সিংহ ভাবিল যে এরূপ জানোয়ারতো সে কোন দিন খাইতে যায় নাই;—তবে বা এটাই তাহাকে খাইতে আসিল। সুতরাং এরূপ 'কিম্ভূত কিমাকারের' সামনে অধিকক্ষণ থাকা নিতান্তই আশঙ্কাজনক মনে করিয়া সে ইহাপেক্ষা নিরাপদ স্থানে যাইবার পন্থা দেখিল।

একজন লোক নানা প্রকার শব্দ ও "বিদ্‌ঘুটে" মুখভঙ্গী করিতে পারিত। এই লোকটাকে একবার সিংহে তাড়া করিল। সে বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়াও দেখিল যে আর বাঁচিবার আশা নাই, এবারে নিশ্চয়ই সিংহ তাহাকে ধরিবে। এমন সময় সে হঠাৎ থামিল। থামিয়াই সিংহের দিকে তাকাইল—আমরা যে রকম করিয়া একে অন্যের পানে তাকাই সেরূপ করিয়া তাকাইল না, সিংহের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া মাথা নোঙাইয়া দুই ঠ্যাঙের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া তাকাইল; আর তখন মুখের এমনি একখানা চেহারা করিল যে তেমন চেহারা আর সে কখনও করে নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভয়ানক শব্দগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া, যে শব্দটী সকলের চাইতে অস্বাভাবিক, সেই শব্দটী করিল। সিংহ থামিল এবং একটু চিন্তান্বিত হইল; আর এক মুখ বিকৃতি, আর এক চীৎকার—সিংহ ভয় পাইল এবং ফিরিল। আর এক চীৎকার—সিংহ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

হঠাৎ কোন স্থানে বিপদে পড়িলে ভয়ে জড়সড় না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মনে মনে ভাবা উচিত।

নং ৩

অভিমানী রাজপুত্র।

রুষিয়ার যুবরাজের পুত্র সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে চাহিতেন না। একদিন তাঁহার মাষ্টার আসিয়া নালিশ করিল "ছোট কর্ত্তা মুখ ধুইতেছেন না।"

যুবরাজ বলিলেন "বটে? আচ্ছা দেখা যাবে, এর পর সে কেমন করিয়া মুখ না ধুইয়া থাকে।"

রাজপরিবারের ছেলে বুড়ো সকলকেই পাহারাওয়ালারা সেলাম করিবে, এরূপ নিয়ম। পর দিন চারি বৎসরের শিশু কর্ত্তাটী মাষ্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একজন পাহারাওয়ালার কাছ দিয়া তাঁহারা গেলেন; সে তালগাছপানা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সেলাম করিল না।

যুবরাজের ছেলেকে সকলেই সেলাম করিয়া থাকে, সুতরাং তিনি ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। একটু পরেই তাঁহারা আর একজন পাহারাওয়ালার নিকট দিয়া গেলেন। এই ব্যক্তিও কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। যুবরাজনন্দন অত্যন্ত চটিয়া মাষ্টারকে বলিলেন। এইরূপ বেড়াইবার সময় অনেক সিপাহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেহই তাঁহাকে সেলাম করিল না। তিনি দৌড়িয়া যুবরাজের কাছে গিয়া বলিলেন:—

"বাবা! বাবা! তোমার বরকন্দাজগুলিকে চাবুক মার। আমি যাইবার সময় এরা আমাকে সেলাম করিতে চাহে না।"

যুবরাজ বলিলেন "বাছা, তাহারা ভালই করে। পরিষ্কার সিপাহীরা কখনও অপরিষ্কার ছোট কর্ত্তাকে সেলাম করে না।" এর পর হইতে যুবরাজনন্দন প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিতেন।

যুবরাজপুত্রের অভিমানই তাহার কু-স্বভাব সংশোধন করাইল।

সার উইলিয়ম জোন্স।

বন্ধুবর পাঠক পাঠিকা! মানুষ নিজের পরিশ্রম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও যত্নের গুণে কত উন্নতি করিতে পারে তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত আজ তোমাদিগকে দেখাইব। তোমরা কি সার উইলিয়ম জোন্সের নাম শুনিয়াছ? তিনি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। এখন হাইকোর্ট নামে কলিকাতাতে যে সর্ব্বপ্রধান আদালত আছে তখন তাহার নাম সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তিনি তাহারই একজন বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু বড় পদস্থ লোক ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার জীবনচরিত তোমাদিগকে বলিতে যাইতেছি তাহা নহে। তিনি নিজ পরিশ্রমে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন তাহাই দেখান উদ্দেশ্য।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উইলিয়ম জোন্সের জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যখন তিন বৎসর মাত্র তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সুশিক্ষিতা মাতার উপরেই তাঁহার শিক্ষার ভার পড়ে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। অতি শৈশব কাল হইতে তিনি উইলিয়ম জোন্সের পাঠে রুচি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। জোন্স যখন দুই তিন বৎসরের বালক তখন কোন নূতন বিষয় দেখিয়া তাহার বিবরণ জানিবার জন্য মাতার নিকট আসিলেই তিনি বলিতেন "পড়, পড়িলেই জানিতে পারিবে।" মায়ের মুখে এইরূপ বার বার শুনিয়া শিশু জোন্সের পড়াতে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্কুলে দিলেন। ১৭৬৪ সালে তিনি স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। অক্সফোর্ডে পড়িবার সময় তিনি এত পরিশ্রম করিতেন, এবং নিজের ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের অপেক্ষা এত অধিক বিষয় শিক্ষা করিতেন যে, তাহা দেখিয়া তাহার একজন শিক্ষক সর্ব্বদা বলিতেন "জোন্সকে যদি বস্ত্রহীন করিয়া একাকী মরুভূমির মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবু সে একটা বড়লোক হইয়া উঠিবে।"

বালক কাল হইতেই তাঁহার নানা ভাষা শিক্ষা করিবার দিকে মনের ঝোঁক ছিল। অক্সফোর্ডে

তিনি গ্রীক ও লাটীন ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নিজের যত্নে ইটালীয়, স্পেনীস, পোর্ত্তুগীজ ও ফরাসিস্ এসকল ভাষাও শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার এতদূর আগ্রহ ছিল যে তিনি এই সময়ে আলিপো নগরবাসী একজন লোককে অনেক টাকা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নিকট পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেন।

একদিকে এত ভাষা শিখিতেন তাহা বলিয়া যে তাঁহার কালেজের পাঠের কোন ব্যাঘাত হইত তাহা নহে; সেখানেও অতি উৎকৃষ্ট রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি ইংলণ্ডের একজন ধনী সন্তানের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া জর্ম্মনি দেশে গমন করেন। সেখানে অবস্থিতি কালে জর্ম্মণ ভাষা অতি উৎকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করেন। জর্ম্মনি দেশ হইতে তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন তখন পারস্য ভাষায় লিখিত নাদির শাহের একখানি জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইংলণ্ডে আসিয়া সেই বই খানি ফরাসি ভাষাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। দিন দিন তাঁহার যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে চমৎকৃত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল কাজের মধ্যে জোন্সের প্রাণে একটী বাসনা প্রবল ছিল। সেইটী কিরূপে চরিতার্থ হইবে তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। সেটী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা। অবশেষে তাঁহার সে বাসনাও পূর্ণ হইল। ১৭৮৩ সালে তিনি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। সে সময়ে কেহই সহজে বিলাত হইতে এদেশে আসিতে চাহিত না। এখন সুয়েজ যোজককে কাটিয়া দেওয়াতে যেমন ২০।২১ দিনের মধ্যে জাহাজ এদেশে পৌঁছে তখন সেরূপ ছিল না। তখন জাহাজ সকলকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইত। তাহাতে আবার তখন কলের জাহাজ ছিল না, জল বায়ুর অবস্থা দেখিয়া জাহাজ সকলকে আস্তে আস্তে আসিতে হইত। আসিতে অনেক দিন লাগিত ও পথে অনেক ক্লেশ হইত। এখন এদেশে অনেক ইংরাজ আসিয়াছেন এবং তাঁহারা সহর গুলিকে অনেক স্বাস্থ্যকর করিয়াছেন। এখন এক জন ইংরাজ আসিলে তাঁহার থাকিবার অসুবিধা হয় না। তখন এ দেশে ইংরাজ ছিল না বলিলে হয়। ইংলণ্ডের লোকের এই ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষে গেলে ফেরা দুর্ঘট সুতরাং বিলাতে করিয়া খাইতে পারিলে কেহ আর এদেশে আসিতে চাহিত না। উইলিয়ম জোন্স ইংলণ্ডে থাকিতেই যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাতে সেখানে থাকিলে তাঁহার করিয়া খাইবার অপ্রতুল হইত না। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে ঐ পদ পাইবা মাত্র তিনি আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিবার সময় তাহাকে সম্মান পূর্ব্বক 'সার' উপাধি দেওয়া হইল।

এখানে আসিয়া তাঁহাকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাজ করিতে হইত। তখন সুপ্রিম কোর্টের কাজ কর্ম্ম বড় জটিল ছিল। বিচারপতিদিগের সুবিচার করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এখানকার জল বায়ু অতিশয়

অস্বাস্থ্যকর ছিল, তাহাতে গুরুতর শ্রম করিতে হইত, ইহাতে সার উইলিয়ম জোন্সের শরীর বার বার অসুস্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাপি তিনি নানা ভাষা শিক্ষা করিতে ছাড়িতেন না। যাহা একটু সময় পাইতেন তাহা সংস্কৃত শিক্ষাতে দিতেন। আদালত যখন বন্ধ হইত তখন তিনি মনের আনন্দে সংস্কৃত পড়িতেন। তিনি পূর্ব্বদেশীয় ভাষা সকলের চর্চ্চার উন্নতি করিবার জন্য "এসিয়াটিক্ সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। ঐ সভা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ শুনা যায় হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী নগরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সার উইলিয়ম নাকি তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ১৭৯৪ সালে তিনি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন। ১৭৯৪ সালে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইল, ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। এতদ্দ্বারা বিচার কার্য্যের অনেক সাহয্য হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুরুতর শ্রম অধিক দিন সহিল না। তাহার শরীর ত্বরায় রুগ্ন হইয়া পড়িল। ১৭৯৪ সালে কোন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৪৮ বৎসরের অধিক হয় নাই। একজন ইংরাজের পক্ষে ৪৮ বৎসর যৌবন কাল বলিয়া গণ্য; সুতরাং তিনি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন। আরও দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

তাঁহার জীবন চরিত লেখক বলেন যে, কতক গুলি বিশেষ গুণে সার উইলিয়ম জোন্স এত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গুণ এই ছিল যে তিনি উন্নতি করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না, সকল কাজের মধ্যে তাঁহার আত্মোন্নতির দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিতেন অন্যে যাহা করিয়াছে আমি কেন তাহা করিতে পারিব না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণ এই ছিল যে তিনি সময় বিভাগ করিয়া যে সময়ে যে কাজ করিবার তাহা করিতেন, এই কারণে দশ কাজের মধ্যে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হইত না। এই সকল গুণ থাকাতে তিনি আশ্চর্য্য উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার সম কালে তাঁহার ন্যায় এত ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিল না বলিলে হয়।

ফুলের সাজি।

প্রথম অধ্যায়।

গত সংখ্যার পর।

নাথ গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময়ে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া বাগানের পার্শ্বস্থিত প্রান্তরের নিকট একটী বটবৃক্ষতলে বসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিত। বালিকা পিতার পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্ট

চিত্তে পিতার কথা শুনিত এবং পিতা কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিত।

একদিন সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে বৃদ্ধ তাহার কন্যাকে বলিল, "মনোরমে ভাবিয়া দেখ দেখি ঈশ্বরের কি অপার দয়া! এই সূর্য্য এতক্ষণ প্রখর রশ্মি বিস্তার করিয়া জগৎকে দগ্ধ করিবেন, ইহাঁর দ্বারা পরমেশ্বর জগতের কত উপকার করাইতেছেন। তাঁহারই প্রসাদে শস্য-ক্ষেত্রে শস্য, বৃক্ষে ফুল ও ফল জন্মিতেছে। তিনি মানবকে যে কত ভালবাসেন তাহা মানুষ ধারণা করিতে পারে না। আমাদের সুখের জন্য তাঁহার কি অদ্ভুত চেষ্টা! বৎসে তোমার কি এমন দয়াময় হরিকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় না?"

মনোরমা। হাঁ বাবা, আমি আগে এই সকল ভাবিয়াছিলাম, যখনই আমরা কোন বিপদে পড়ি, তখনি তিনি আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। আমার পীড়া হইলে তুমি যেমন কিসে আমি আরোগ্য হব তাহারই জন্য ব্যস্ত থাক ঈশ্বরও তেমনি জগৎশুদ্ধ লোকের জন্য ব্যস্ত।

এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া গিয়া একটী বড় গোলাপ লইয়া পিতাকে উপহার দিল।

দীননাথ ফুল পাইয়া কহিল "মনোরমে, গোলাপ ফুল দেখিতে কেমন সুন্দর, এই ফুলটী যেন বিনয়ের প্রতিকৃতি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটী সুন্দর ফুল আছে সেটী লজ্জাশীলা সচ্চরিত্রা বালিকার সুকোমল বদনমণ্ডল। বিনয়ী বালিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল। এই গোলাপটীতে কর্দ্দম লাগিলে, ইহা যেমন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বালিকার মুখে লজ্জা ও বিনয় না থাকিলে তাহাও বিশ্রী দেখায়। দেখিও যেন তোমার মুখে মলিনতা না স্পর্শ হয়।

আর দুটী একটী কথা বলিলেই মনোরমার বাগানের অধ্যায় শেষ হয়। মনোরমার পিতা উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে কন্যার জন্মদিনে একটী আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল; গাছটী মনোরমার বড় প্রিয়, সে যত্নের সহিত প্রতিদিন তাহাতে জল সেচন করিত। গাছটী যেন দেখিতে একটী গোলাপের তোড়া। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি তাহার পূর্ব্ব বৎসরে মনোরমার গাছে এত আম হইয়াছিল যে তাহার আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু এ বৎসর মনোরমা দেখিল যে বৃক্ষটী শুকাইয়া যাইতেছে, তখন সে দুঃখিত মনে পিতাকে বলিল "হায় আমার এমন চমৎকার আমের গাছটী মরিয়া যাইতেছে।"

দীননাথ বলিল, মা রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ সহিতে না পারিয়া গাছটী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পাপের প্রভাবে মানবগণও এই রূপে শুষ্ক হইয়া যায়। যাহাদের উপর কত আশা, কত ভরসা এমন বুদ্ধিমান্ যুবকেরাও পাপাসক্ত হইয়া অকালে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। কেবল যুবকেরা কেন অনেক রমণীও অল্প বয়সে পাপপ্রলোভনে পড়িয়া শেষে আপনার জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব সাবধান! সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে। প্রলোভন নিকটস্থ হইলে তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে। বৎসে, সাবধান কখন মন্দ কার্য্য বা চিন্তা করিও না। সর্ব্বদা কায়মনে পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর আমাদের পরম সহায়। দেখ, তুমি তোমার গাছটীর দশা দেখিয়া যেমন দুঃখিত হইতেছ, আমার যেন তোমায় বিপথগামিনী দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে সেইরূপ দুঃখ করিতে করিতে চিতা-

রোহণ না করিতে হয়।

বৃদ্ধ বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার কথাগুলি মনোরমার প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হইল, সে কথাগুলি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিল।

সাধু পিতার সহিত সহবাসে মনোরমার মন দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ দীননাথ তাহার বৃক্ষ সকলের শোভা দেখিয়া মোহিত হইত, বটে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কন্যার সাধুতায় তাহার মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইত। ঈশ্বর প্রসাদে দীননাথের এত যত্নে কন্যাপালন ব্রত সুফল প্রদান করিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মদিনের উপহার।

মনোরমা ও তাহার পিতা যে গ্রামে পরম সুখে কালক্ষেপণ করিত, সেই গ্রামে গৌড়েশ্বরের একটী বাগানবাড়ী ছিল। এই বাগানে রাজা, রাজমহিষী ও তাঁহাদের একমাত্র কন্যা হেমলতা গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন। রাজধানীতে অনেক লোকের সমাগম বলিয়া গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে বাস করা অত্যন্ত সুখজনক। একদিন মনোরমা কোন পুষ্করিণী হইতে কতকগুলি পদ্মফুল তুলিয়া তাহার দুই ছড়া মালা গাঁথিয়া বাড়ী আসিতেছে এমন সময়ে অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে রাজকুমারী তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি, মনোরমার হস্তে মনোহর পদ্মমালা দেখিয়া, তাহাকে ডাকিবার জন্য কোন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিকা মনোরমার নিকট আসিয়া তাহাকে রাজকন্যার আহ্বান জানাইল। মনোরমা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, অগত্যা ধীরে ধীরে পরিচারিকার সঙ্গে রাজকুমারী হেমলতার নিকট উপস্থিত হইল।

হেমলতা দেখিতে সুশ্রী, তাঁহার হৃদয় অহঙ্কারশূন্য। তিনি মনোরমার পবিত্র মুখখানি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষিণী হইলেন। ধন্য সরলতা, ধন্য পবিত্রতা, তোমরা দরিদ্র কন্যাকে রাজকুমারীর মনহরণ করাও, কুরূপাকে সুন্দরী কর, মূর্খকে জগৎমান্য করাও!

হেমলতা বলিলেন, "ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়?"

মনোরমা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কুমারি আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত দীননাথের কন্যা, আমার নাম মনোরমা, এই উদ্যানের অনতিদূরেই আমার পিতার বাসস্থান, যদি কৃপা করিয়া এই মালা ছড়াটী গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।"

এই বলিয়া সে এক ছড়া মালা তাঁহার করে অর্পণ করিল। হেমলতা পরম আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে রাজমহিষী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হেমলতার মুখে মনোরমার বিষয় জানিয়া ও তাঁহাকে সুশীলা দেখিয়া পরম আনন্দিতা হইলেন। মনোরমা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হাতের অপর

মালা ছড়াটী তাঁহার পদতলে স্থাপন করিল।

রাজমহিষী মনোরমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য পাঁচটী মুদ্রা বাহির করিলেন।

মনোরমা সবিনয়ে কহিল "মা আমি কি পুরস্কার না লইয়া এই মালা আপনাদিগের চরণে উপহার দিলে আপনারা তাহা গ্রহণ করিবেন না?"

মহিষী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মনোরমে, হেমলতা পদ্মফুলের মালা বড় ভালবাসে, যতদিন ফুল পাইবে তত দিন প্রত্যহই হেমের জন্য এক এক ছড়া মালা আনিবে।"

মনোরমা "যে আজ্ঞা," বলিয়া উত্তর দিল, সে দিন হইতে প্রতিদিন সে মালা আনিয়া রাজকুমারী হেমলতাকে প্রদান করিত। হেমলতা, মনোরমার কথায় ও ব্যবহারে ক্রমশঃ এত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন যে, তাহাকে পাইলে অল্পে ছাড়িতেন না। তিনি, তাহাকে রাজপরিবারের মধ্যে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু মনোরমা তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল। সে পিতার সঙ্গে থাকিয়া ও কথোপকথন করিয়া ও তাহার সেবা করিয়া যে বিমল সুখ পাইত তাহা রাজভবনে কোথায় মিলিবে? এইরূপে দেখিতে দেখিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। হেমলতার সঙ্গিনীরা, রাজকুমারীকে মনোরমার প্রতি অনুরক্তা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইল।

ক্রমশঃ।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা হয়ত আজও শোন নাই যে তোমাদের দেশের একটী অতি প্রাচীন হিতৈষী বন্ধু ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় আজও বিস্মৃত হও নাই যে অক্ষয় বাবু কে? বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র জীবনী আমরা তোমাদিগকে গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে উপহার দিয়াছি। তিনি গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৩ টার সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি এরূপ রুগ্ন হইয়াছিলেন যে তিনি যেন জীবিত অবস্থায়ই মৃত্যুর কোলে শয়ান ছিলেন। তাঁহার সামাজিক জীবন এক প্রকার লোপ হইয়াছিল বলিলেই হয়, তিনি এক প্রকার সাধারণ লোকের নিকট মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা কি জান তিনি তোমাদের জন্য, তোমাদের জন্মভূমির জন্য কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আজ কাল কত ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে পাও, কত ভাল ভাল সংবাদপত্র দেখিতে পাও, তোমরা কত নীতিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প, কত বিজ্ঞানের কথা পড়িতেছ, তোমরা সখা পাইয়াছ কিন্তু তোমরা কি জান কোন্ মহাত্মার প্রসাদে তোমরা এই সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছ? অক্ষয় বাবুর পূর্ব্বে তোমাদের দেশে এ সকলের সূত্রপাতও হয় নাই—তিনিই এ সমস্ত প্রথমে দেশে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে যে সমস্ত ছিল তাহার বিষয় আর তোমাদিগকে জানিয়া কাজ নাই, অশ্লীল কথা, অশ্লীল গল্প, অশ্লীল ভাবই

তাহার প্রাণ। যে কয়েকখানি সংবাদপত্র ছিল তাহাদের অবস্থাও তদনুরূপ। সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাতে কিছুই থাকিত না—থাকিত কেবল সাধারণের কুরুচির স্রোতকে সহায়তা করিবার জন্য কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গল্প ও ব্যক্তিগত গালিগালাজ। অক্ষয় বাবু সর্ব্বপ্রথমে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সাহায্যে এই জাতীয় কুরুচির স্রোতকে বাধা প্রদান করেন। তাঁহারই অসাধারণ সত্যানুরাগ, তাঁহারই অসাধারণ নৈতিক চরিত্রের মহিমা দেশের দুরবস্থাকে অনেক উন্নত করিয়াছিল তাই আজ তোমরা এই সকল সুখের অধিকারী হইয়াছ। মহাত্মা রাজা রামমোহনের পর দেশত পুনরায় কুপথে যাইতেছিল, অক্ষয় বাবুই এমত সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে নৈতিক শক্তি প্রদান করিয়া দেশকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনিই দেশীয় লোকদিগকে বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। তিনিই বুঝাইয়া দিলেন যে বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ না হইলে দেশের দুরবস্থা দূর হইবে না, দেশ কখনই উন্নত হইবে না। কিন্তু তিনি আর যে একটি জিনিস দিয়া গিয়াছিলেন তাহার নিকট এসকলও অতি সামান্য। তিনি আমাদিগকে মানুষ হইতে শিখাইয়া গিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন কার্য্যের ইচ্ছা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে মানুষ যে মানুষ হইতে পারে না, মানুষ যে কেবল অপরের হস্তে পুত্তলিকা তাহা তিনি আমাদিগকে বিশেষ রূপে শিখাইয়া গিয়াছেন। যে স্বাধীনতার জন্য আজ আমরা লালায়িত যে স্বাধীন ভাব দেশে প্রবেশ করিয়া আজ কাল দেশীয় যুবকদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে সেই স্বাধীন ভাব সর্ব্ব প্রথমে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের মনে প্রবিষ্ট হয়। আজ তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন আইস ভাই বোন্, আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি আমাদের প্রধান অলঙ্কার করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি।

ধাঁধা।

—:o:—

গত বারের সচিত্র ধাঁধার উত্তর।

১। নব বরষে থাক হরষে
সখা পড়গো কষে

———

নূতন ধাঁধা।

১। ১ হইতে ৯ কে এমন তিন লাইনে বসাও যে লম্বভাবে, পাশাপাশি বা কোণাকোণী ভাবে অঙ্কগুলি যোগ করিলে যোগ ফল ১৫ হইবে।

নূতন প্রকারের ধাঁধা।

উপরোক্ত ছবিটী অবলম্বন করিয়া একটী রচনা লেখ; যাহার রচনা ভাল হইবে তাহার রচনা সখায় প্রকাশিত হইবে।

সখা

চতুর্থ ভাগ। সপ্তম সংখ্যা।

১ জুলাই, ১৮৮৬।

প্রবাল দ্বীপ।

গত মে মাসের সখাতে প্রবাল কীটদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। এবারে উহারা যে আশ্চর্য্য দ্বীপ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিতেছে, তাহাদের বিবরণ কিছু দিব। ঐ সকল কীট দ্বীপ নির্ম্মাণ করে, একথা বলা ঠিক নহে। উই পোকারা বল্মীক নির্ম্মাণ করে, বাবুই পাখী চমৎকার কৌশলে বাসা নির্ম্মাণ করে, বীবরেরাও অতি আশ্চর্য্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, এবং মানুষেরা আপনাদের বুদ্ধি কৌশলে কত কি অদ্ভুত পদার্থ সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল কীট সে রূপে কিছুই করে না। ইহাদের কর্ত্তৃত্ব একটুও নাই। দ্বীপ নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর। ইহাদের দেহের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা তিনি আপনিই দ্বীপ প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহারই আশ্চর্য্য কৌশল সর্ব্বত্র দেখা যায়। এখানেও তাই।

যে সকল ডাকাত বা খুনী আসামীর চিরজীবনের মত দ্বীপান্তরিত হওয়ার সাজা হয় তাহাদিগকে ভারত মহাসাগরের আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে চালান দেওয়া হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। ঐ সকল দ্বীপের অনেকগুলি প্রবালকীটদিগের দেহের পূর্ব্ব লিখিত কঠিন অংশে নির্ম্মিত। মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যেও বিস্তর দ্বীপপুঞ্জ এই রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাল দ্বীপগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর; কোথাও একটী দ্বীপ বা সাগরের ধারের কোন দেশের কিনারায় সাদা ধপ্ ধপ্ কচ্ছে। প্রবাল দেহ রাশি জোয়ারের সময়ে সব ডুবিয়া যায়; চারিদিকে নীল জল অসীম, অকূল, উপরে অনন্ত নীল আকাশ, আর সুমুখে শুভ্রবর্ণ প্রবাল দেহ সকল ভাঁটার সময়ে যখন উচ্চ হইয়া দেখা দেয়, তখন কি চমৎকারই শোভা হয়! কল্পনা করিলেও প্রাণে কত আনন্দ হয়!

প্রবাল কীটের দেহ দ্বারা যে নূতন জমি প্রস্তুত হয়, তাহা তিন প্রকার। এক প্রকার দেখা যায় যে, তাহারা কোন দ্বীপের চারিদিকে বা উপকূলস্থিত কোন দেশের ধারে ধারে বাস করে। ঐ দ্বীপ বা দেশের যে যে দিকে নদী নাই এবং বাতাস বহিয়া জলে খুব ঢেউ হয় ও সাগরের স্রোত খুব প্রবল, সেই দিকেই প্রবালদিগের বাস করিবার বড় সুবিধা হয় ("প্রবাল কীট" দেখ।) তাহারা মনের আনন্দে বাড়িতে থাকে। এক দল মরিয়া যায়, আর এক দল

তাহাদের কঙ্কালময় দেহের উপরে বসিয়া আবার আনন্দে জীবন কাটায় ও প্রত্যেকে শত শত নূতন কীট উৎপন্ন করিয়া আপনারা প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে দলে দলে প্রবাল কীটেরা যখন উপর্য্যুপরি বাড়িতে থাকে, তখন ক্রমে ঐ প্রবাল-নিবাস উচ্চ হইয়া উঠে। অবশেষে যখন এমন হয় যে, তাহাদের দেহ ভাঁটার সময়ে জল ছাড়াইয়া উঠে আর জোয়ারে ডুবিয়া যায়, তখন তাহাদের কিছু ক্লেশ হইতে আরম্ভ হয়। কেন না যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাঁহারা মৃত প্রায় হইয়া যায়। ক্রমে এই রূপে উপরের কীটগুলি প্রাণত্যাগ করে ও জলাভাবে তাহাদের দেহের উপর আর অন্য কীট জন্মিতে পারে না। সুতরাং তাহার উচ্চতা ঐ অবধিই এক প্রকার বন্ধ হয়। তবু বাতাসে ও স্রোতের জোরে জীবিত বা মৃত প্রবাল-দেহ বিস্তর ভাসিয়া বা চালিত হইয়া তাহার উপর পড়ে ও ক্রমে ঐ স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইতে থাকে। এবং যত ঘাস ও অন্যান্য ছোট ছোট চারা গাছ জন্মিয়া জমি শক্ত হইয়া উঠে, ততই উহা স্থায়ী হইতে থাকে। এই প্রকারের প্রবাল নির্ম্মিত স্থানকে ইংরাজীতে Fringing Reef বা উপকূলস্থ প্রবালাবাস কহে। (ছবি দেখ) ক—একটী দ্বীপ, তাহার চারিধারে খ—শ্বেতবর্ণ প্রবালাবাস দ্বারা ঘেরা, তার পর সাগর। মাডাগাস্কার দ্বীপ ও আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে এই জাতীয় প্রবালাবাস বহুদূর ব্যাপিয়া আছে।

(২য়তঃ) আর এক জাতীয় প্রবালাবাস দেখা যায়, তাহা আর একটু আশ্চর্য্য। তাহা দ্বীপ বা দেশের গায়ে লাগিয়া থাকে না। উপকূল হইতে অনেক দূরে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে। এই জাতীয় প্রবালাবাস হইতে উপকূল ৫।১০ কখন কখন ২০।৩০ মাইল দূরে থাকে। মধ্যে যে জলভাগ তাহার গভীরতা খুব অল্প, তথায় স্রোত ও তুফান কম এবং তাহার তলা হইতে মাটি তুলিলে তাহাতে প্রবালদিগেরই মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জলভাগের পর প্রবালদিগের বাসস্থান চারিদিকে ঘিরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব ভাগে উপকূল হইতে প্রায় ২০।৩০ মাইল দূরে ১২০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড একটী প্রবালাবাস আছে। তথা হইতে উপকূল পর্য্যন্ত ঐ যে ২০।৩০ মাইল সাগর, তাহার গভীরতা এত কম যে তাহাকে সাগর না বলিয়া Inner passage অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী জল-প্রণালী কহে; বস্তুতই উহার গভীরতা কোথাও ১০০ হাতের অধিক নহে, বরং অনেক স্থলে কম। কিন্তু ঐ প্রবালাবাসের বাহিরেই সাগরের গভীরতা একেবারে অনেক বেশী। এরূপ কেন হয় পরে বলিব। এই জাতীয় প্রবাল নির্ম্মিত স্থানকে ইংরাজীতে Barrier Reef বারীয়ার রীফ্ কহে। (ছবি দেখ); ক—দ্বীপ, খ—এই জাতীয় প্রবালাবাস, গ—মধ্যস্থ জলপ্রণালী, দুই পার্শ্বে অতলস্পর্শ সাগর।

(৩য়তঃ) উপরে যে দুই জাতীয় প্রবালাবাস বর্ণিত হইল, তাহারা কেহই বাস্তবিক প্রবাল দ্বীপ নহে। কিন্তু যথার্থই লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, চেগোস্ দ্বীপপুঞ্জ, ক্লেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জ, লো দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রবাল দ্বীপের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহারা যথার্থই দ্বীপ। চারিদিকে অকূল সাগর, মধ্যে ১০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রবালদের নির্ম্মিত গোলাকার দ্বীপ। এই জাতীয় দ্বীপ বড় আশ্চর্য্য। ইহারা অন্যান্য দ্বীপের মত নহে। ইহাদের সকলেরই মধ্যস্থলে এক একটী প্রকাণ্ড হ্রদ বা জলাশয়, আর তাহারই চারিদিকে জমি। একটা থালায় জল রাখিয়া তাহাতে একটী সোণার বালা রাখিলে যেমন হয়, চারিদিকে জল ভিতরেও জল মাঝখানে উচ্চ সোণার বালা;—তেমনি চারিদিকে নীল সাগর, মাঝ খানে দ্বীপের ভিতরেও সাগরের জল স্থানে স্থানে ভাঙ্গা পথদিয়া প্রবেশ করিতেছে ও খেলিতেছে, আর তাহারই চারিদিকে কোথাও আধ পোয়া, কোথাও একপোয়া (অর্দ্ধ মাইল) চওড়া প্রবাল দ্বীপ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর নারিকেল গাছ ও অন্যান্য চারা গাছ সকল হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে, আবার মানুষ তথায় ঘর বাড়ী করিয়া বাস করিতেছে! কি আশ্চর্য্য! (ছবি দেখ।)

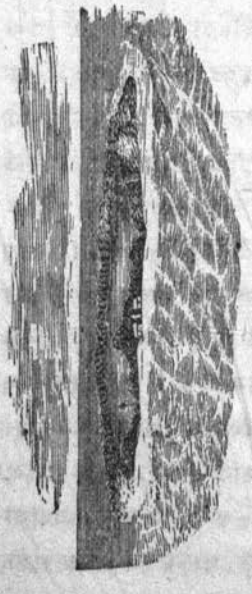

এই জাতীয় প্রবালাবাসই বস্তুতঃ প্রবাল-দ্বীপ;—ইংরাজীতে ইহাদিগকে Atoll কহে। ইহাদের ভিতরের যে হ্রদ তাহার গভীরতা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু বাহিরের দিকে সাগরের গভীরতা হঠাৎ অপরিমেয়।

এখন তিন জাতীয় প্রবালাবাস কিরূপ তাহা বুঝিলে। কিন্তু কিরূপে ইহারা যে নির্ম্মিত হয়, তাহা বুঝা তত সহজ নহে। বড় বড় পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। কথা এই যে, ঐ সকল কীট যদি ৯০ হইতে ১৮০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জলের নীচে না বাঁচে, (মে মাসের সখা দেখ,) তবে এই অতলস্পর্শ সাগরের মধ্যে কোথা হইতে ও কিরূপে এত বড় বড় দ্বীপ Atoll নির্ম্মাণ করিল? কিরূপেই বা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্ব উপকূলে ও অন্যান্য স্থানের "বারীয়ার রীফ" গুলি প্রস্তুত করিল? উপকূলস্থিত প্রবালাবাস বুঝা খুব সহজ। কিন্তু আর দুই জাতীয় দ্বীপ কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, একথা কোন পণ্ডিতই প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। কত লোকে কত রকম কথা আন্দাজ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠিক কথাটী কেহই বলিতে পারিলেন না। প্রবাল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী হ্রদই বা কোথা হইতে আসিল, আর তাহার জলই বা এত কম গভীর কেন, তাহারও কোন মীমাংসা হইল না। শেষে Charles Darwin প্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই ঠিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ডারউইন সাহেব বলেন যে, শেষোক্ত দুই জাতীয় প্রবালাবাসই প্রথমে উপকূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ক্রমে বহু কালে ঐরূপ আকার লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মনে কর